স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা

২১ নভেম্বর - ২০১১,
৪ অগ্রহায়ণ - ১৪১৮
৬৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

অশান্ত মণিপুর

আইজাক ও মুইভা (বসে)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

তৃণমূলের 'সুসময়' কতদিন চলবে তা সময়ই বলবে ❑ ৮

বিমান বসু: জননীর জঠরের লজ্জা ❑ ৯

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ রুখতে চাই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ ❑ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑ ১১

দেশীয় রাজ্যগুলি সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে অটোভন বিসমার্কের সঙ্গে প্যাটেলের তুলনা সামঞ্জস্যহীন ❑ প্রফুল্ল গোরাডিয়া ❑ ১৩

অশান্ত মণিপুর : শেকড় অনেক গভীরে ❑ বাসুদেব পাল ❑ ১৫

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মণিপুরে উগ্রপন্থীরাই পথের কাঁটা ❑ শঙ্কর পাল ❑ ১৭

আউটসোর্সিং : কুফলের মাসুল গুণছি রাজনৈতিক ভাবেও ❑ কৃশানু মিত্র ❑ ২০

'বিচ্ছিন্নতাবাদে'র সমস্যায় জেরবার উত্তরবঙ্গ ❑ ২১

কার্তিক উৎসব ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ২৪

ঐতিহাসিক দুর্গ ঝাঁসি ❑ সোমশুভ্র চক্রবর্তী ❑ ২৫

খোলা চিঠি : তিনি গর্জালেন অনেক বর্ষালেন কই? ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২৬

একান্ত সাক্ষাৎকার : কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে কোনও উদ্যোগই নেই সরকারের : **অরুণ জেটলি** ❑ ২৭

মহাশক্তিধর হওয়ার প্রতিযোগিতায় নয়, ভারতবর্ষ ভারত হয়েই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে : শ্রীভাগবত ❑ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৯** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑
ভাবনা-চিন্তা : ২৩ ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০** ❑ **শব্দরূপ : ৩১** ❑ **রঙ্গম : ৩২**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অশান্ত মণিপুর— পৃঃ ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩, ২১ নভেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

গিলানি 'ম্যান অফ্ পীস্'?

মিশরের 'শার্ম আল শেখ'-এর পুনরাবৃত্তি দেখা গেল মালদ্বীপে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ এইবার সচেতনভাবেই বিগলিত হইয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানিকে 'শান্তির দূত' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দিলেন। বস্তুত, তিনি নিজেই আরও একবার বোলচাল ও ব্যবহারে বিজেপি-র শীর্ষ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীর বহুচর্চিত বয়ান, 'ভারতের দুর্বলতম প্রধানমন্ত্রী'—কথাটিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলা যাইতে পারে। অথচ সেই সময় তিনি ও তাঁহার দলের কতিপয় নেতা-নেত্রী আদবানীজীর কথায় রুষ্ট হইয়া যারপরনাই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, বারে বারে প্রধানমন্ত্রীর দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীকে শান্তির দূত (ম্যান অফ্ পীস) আখ্যায় ভূষিত করিলে ভারতবর্ষের দীর্ঘকালীন অভিযোগ—জম্মু-কাশ্মীরে 'সীমাপার সন্ত্রাসের' বিষয়টি লঘু হইয়া পড়ে। ইহা যে ডঃ মনমোহন সিংহ বুঝিতে পারেন না তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মাত্র দুই মাস পূর্বেই ভারতবর্ষের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন রাজধানী দিল্লীতে নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের বৈঠকে পাকিস্তান সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করিবার পর পাকিস্তানে আমেরিকার সম্বন্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাড়িতেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার অলিন্দে বহুসংখ্যক কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে যাহা ভারতের পক্ষে নিতান্তই উদ্বেগের কারণ।'' উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ প্রধান, অর্ধ-সৈনিক বাহিনীর এবং বিবিধ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। ইহা প্রধানমন্ত্রীর কর্ণগোচর হয় নাই অথবা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন এমন ভাবনা করাও সম্ভব নয়।

পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত মোলাকাত হইলেই ডঃ সিং কেন যে মোহিত হন তাহা সাধারণ মানুষের জানাশোনার বাহিরে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ এবং তাহাদের প্রধান দল কংগ্রেসের নেতারা বারে বারে দেশবাসীকে বলিয়া আসিতেছেন যে, ২০০৮-এর মুম্বাই হামলায় পাকিস্তানের যুক্ত থাকিবার বহুবিধ প্রমাণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার মোতাবেক তাহাদেরকে প্রদান করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে বিশেষ সংগঠনটি মুম্বাইয়ে হামলায় জড়িত তাহার নাম—'জামাত উদ্ দাওয়া'। ইহা এক ভারতবিরোধী পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী জিহাদী সংগঠন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান হাফিজ সৈয়দকে ওই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইলেও সম্প্রতি পাক-আদালত তাহাকে সর্ববিধ অভিযোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা যে চক্ষে ধূলা দিবার প্রয়াসমাত্র ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই। ২০০৮-এ মুম্বাই আক্রমণের ঘটনা ঘটিবার পর যে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করিবার এবং পাকিস্তানের প্রতি সন্ত্রাস বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স'-এর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন?

অতি সম্প্রতি দিল্লীতে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। তাহার পরও পাক-প্রধানমন্ত্রীকে 'শান্তির দূত' আখ্যায়িত করাটা কি বাস্তবসম্মত? প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ এবং দেশের অভ্যন্তরে পাক-পন্থী জিহাদিদের দাপাদাপি অব্যাহত। তবুও পাক-প্রধানমন্ত্রীকে দরাজ হস্তে সার্টিফিকেট দানে প্রধানমন্ত্রী পিছপা হন না—ইহা বড়ই বিস্ময়ের। ইহার দ্বারা কাহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। মিশরের 'শার্ম আল শেখ' হইতে সেই মনমোহিনী ট্রাডিশন সমানে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে কোনও ব্যত্যয় ঘটে নাই।

বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান সেই '৪৭ সাল হইতেই ভারত আক্রমণ করিয়া আসিতেছে। একবারও জয়লাভ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, ১৯৯৯-এর কারগিল যুদ্ধ ব্যতীত প্রতিবারই পাকিস্তান ভারতভূমি গ্রাস করিয়াছে স্রেফ্ ভারতীয় শাসকদের কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্যই। '৭১-এর যুদ্ধে ভারতের হস্তে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর পাকিস্তান ভারতকে রক্তাক্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জিহাদী, আত্মঘাতী প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের দিয়া ভারতের অন্দরে এজেন্ট তৈরি করিয়া একের পর এক আঘাত (Proxy War) হানিয়া যাইতেছে। মুম্বাই আক্রমণে নিরপরাধ ভারতবাসী ও বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশের পর্যটকদের হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পাক নাগরিক কাসভকে পাকিস্তান রাষ্ট্রহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যদিও সংবাদমাধ্যমের দৌলতে তাহার পাকিস্তানী পরিচয় বার বার সামনে আসিয়াছে। পাক-দখলীকৃত কাশ্মীরে বহাল তবিয়তে সরকারি তত্ত্বাবধানে সন্ত্রাসী-জিহাদী প্রশিক্ষণ শিবির চলিতেছে। ওইসব জিহাদী সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যই ভারতবর্ষ। তাহাদের প্রশ্রয়দাতা পাক-প্রধানমন্ত্রীকে 'ম্যান অফ্ পীস্' বলাটা জাতীয় স্বাভিমানবোধকে নির্মমভাবে আঘাত ছাড়া আর কী বলা যাইবে?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মনে রাখিতে হইবে যে বালকদিগের সাধনার এবং গুরুর সাধনার একই সমতল আসন—এখানে গুরুশিষ্য সকলে একই স্কুলে ভর্তি হইয়াছেন তখন আপনা হইতেই কাজ হইবে। যখন আমরা মনে করি আমরা দিব, অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাদের চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনও সত্য পদার্থ দিতে পারি না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রশাসনিক মদতে কুরবানী

সংবাদদাতা॥ হাইকোর্টের নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সহযোগিতায় ঈদ-এর দিন (৭ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গো-হত্যা হয়েছে বলে জানতে পারা গেছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিলিপি দেখানো সত্ত্বেও পুলিশ ও থানা কর্তৃপক্ষ দাঁড়িয়ে থেকে গোহত্যায় সহযোগিতা করিয়েছে বলে স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ জানিয়েছেন। এরকম ঘটনা ঘটেছে কলকাতার লাগোয়া রাজারহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কড়াইবেড়িয়া, দুর্বারহাট, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে শিশুরগ্রামের শুদ্ধপাড়ায় এবং হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে।

অথচ গত ২ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ন্যায়মূর্তি জয়নারায়ণ প্যাটেল এবং বিচারপতি অসীম কুমার রায় কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে রাজ্য সরকারকে ''পশ্চিমবঙ্গ পশু বধ নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম ১৯৫০'' যাতে লঙ্ঘিত বা অবমানিত না হয় সেজন্য রাজ্যকে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই রায়ে আরও বলা হয়েছিল যে, রাজ্য সরকারের অফিসারদের অথবা স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এমন কোনও ক্ষমতা নেই যাতে করে ইদ্-উদ্-জোহার উৎসব, ৭ নভেম্বর ২০১১-তে কুরবানীর জন্য গবাদি পশুর বাজার চালানোর সুবিধা প্রদান করা যায়। উপরি উল্লিখিত রায়ের প্রতিলিপি স্বস্তিকা দপ্তরে এসেছে। অথচ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কড়াইবেড়িয়া গ্রামের হিন্দুরা হাইকোর্টের রায় অনুসারে কুরবানীতে বাধা দিলে রামনগর থানার পুলিশ গত ৮ নভেম্বর ১১ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেয় (কেস নং-৮৬/৮/১১/২০১১)। এমনকী পুলিশ গ্রামের হিন্দু যুবক-যুবতীদের ব্যাপক মার-ধর করেছে বলে অভিযুক্তরা জানিয়েছেন। গ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং অত্যাচার করা হয়েছে। ফলতা থানার দুর্বারহাটেও একইরকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে আদালত ১৪ জন নিরপরাধ হিন্দুকে 'পীস কীপিং বন্ড'-এ সই করার আদেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। কেস নং M-১১৪৬/১১, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা আদালত।

এই খবর লেখা পর্যন্ত ১১ জন হিন্দু জামিন পেয়েছে। সাতজন অভিযুক্ত হিন্দু একই কেসে এখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। প্রশাসনের এই একতরফা তোষণ নীতিতে হিন্দুদের মনোভাব ক্রমশ সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

হায়দরাবাদ দিয়ে দাউদের দলবল জাল নোট পাচার করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের অভ্যন্তরে তাদের অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থের যোগান ঠিক রাখতে দাউদ বাহিনী হায়দরাবাদ বিমানবন্দরকে ব্যবহার করে যাত্রীদের মাধ্যমে জাল নোট পাচার করছে। অন্ধ্রপ্রদেশের তদন্তকারী অফিসাররা সম্প্রতি তাঁদের একটি অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির তুলনায় এই জাল নোটের পরিমাণ কম হলেও দাউদবাহিনী উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের দেশে ফেরার সময় জাল নোট নিয়ে যেতে নানাভাবে প্রলোভিত করছে।

সংবাদে প্রকাশ, দাউদের দালালরা অন্ধ্রের নিজামাবাদ, করিমনগর এবং কাদাপার মতো জেলাগুলি থেকে দুবাইয়ে কাজের খোঁজে যাওয়া গরীব শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। এদের মধ্যে যারা খুবই গরীব, যারা দেশে ফেরার টিকিটের পয়সা যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যায়, দাউদবাহিনী মওকা বুঝে তাদের প্লেন-টিকিট কেটে দিচ্ছে। শর্ত হিসেবে যাত্রীদের ধরিয়ে দেওয়া হয়— কাপড়-চোপড়, প্রসাধন সামগ্রীতে ভরা সুটকেস। কার্বন কাগজে মোড়া জাল নোটগুলি থাকে সবার নীচে। অনেক সময় ফটো অ্যালবামের ভেতর জাল নোট ঢুকিয়ে পলিথিন দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়।

হায়দরাবাদ পুলিশের অন্তর্তদন্তে আরও প্রকাশ জনৈক বাবু গৈথান নামে এক ব্যক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ীই হায়দরাবাদে জাল নোটের আস্তানা বানানোর মতলব করেছে দাউদবাহিনী। খবর অনুযায়ী আদতে অন্ধ্রের বরকাবাসী এলাকা থেকে অধুনা দুবাই প্রবাসী গৈথান তার সহযোগী মুম্বাইবাসী আফতার ভাটকীর সঙ্গে যোগসাজসেই এই জাল নোট পাচারের ব্যবসা ফেঁদেছে। হায়দরাবাদকে বেছে নেওয়াও তাদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

রিপোর্টে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো জাল নোট হায়দরাবাদে ঢোকার পর বাবু গৈথান তার অন্ধকার জগতের সুলুক সন্ধান ও আড়কাঠিদের কাজে লাগিয়ে জাল নোট বাজারে চালান করাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী আকাশ পথে জাল নোট চালানের ব্যবসা এমনভাবে শুরু হলেও তা ক্রমবর্ধমান। ভারতের বাজারে বেআইনীভাবে চালু থাকা নোটের শতকরা আশি ভাগই অবশ্য মালদা জেলা হয়েই ঢুকছে। মালদা থেকে অনায়াসে লোক বাংলাদেশ যাচ্ছে, ইচ্ছে মতো জাল নোট নিয়ে ফেরত আসছে। সম্প্রতি একটি পুলিশি সূত্রে আরও প্রকাশ— ''মালদা জেলায় বাংলাদেশে ছাপানো জাল নোট ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান করার ব্যবসা এখন কুটির শিল্প হিসেবে রমরম করে চলছে।'' পুলিশি তথ্য অনুযায়ী জাল নোটের কুটির শিল্পে নিযুক্ত অপরাধী বাহিনী দেশের নানান অঞ্চলে পৌঁছে ১০০০ বা ৫০০ টাকার জাল নোটগুলি অবলীলায় ব্যবহার করে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনছে আর ফেরত হিসেবে দেশের আসল টাকা পকেটে পুরছে।

বারাসাতে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে গো হত্যা বন্ধ

সংবাদদাতা॥ বারাসাত থানার নিবাধই এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঐতিহ্যবাহী হিন্দু প্রধান এই গ্রামের মাঝখানে কয়েক ঘর মুসলিমের বাস খাঁ পাড়ায়। এখানে কোনওদিন গো-হত্যা হয়নি, এমনকী বকরীদের দিনেও নয়। গত ৭ নভেম্বর বকরীদের দিন এই পাড়ার কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবক গোরু জবাই-এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য গোরুটিকে সুসজ্জিত করে এলাকায় ঘোরানো হয়। স্বাভাবিক কারণে তাতে গ্রামের হিন্দু যুবকদের টনক নড়ে। প্রায় কয়েকশো যুবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ করায় গো হত্যা বন্ধ হয়। এই ঘটনায় পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ। তবে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

কালো টাকার তদন্তে বিপুল পরিমাণ কর-ফাঁকি দেওয়া অর্থের হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি গোয়েন্দারা দাবি করছেন যে তাঁরা ইতিমধ্যেই 'প্রভূত পরিমাণ অর্থে'র হদিশ করে ফেলেছেন যার পরিমাণ 'হাজার হাজার কোটি টাকা'। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, কালো টাকার অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেভাস্থিত দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড (এইচ এস বি সি) ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের ৭০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে যেগুলিতে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা থাকার জন্য কোনও কর দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে দিল্লী-কেন্দ্রিক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের চল্লিশ কোটি টাকা এবং জনৈক চেন্নাইনিবাসী অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের ষাট কোটি টাকা আপাতত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তা হিমশৈলের চূড়া বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগস্ট 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' দৈনিকের প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয় যে— গত জুলাইয়ে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির যাবতীয় তথ্য ভারতকে দিয়েছেন ফরাসী কর্তৃপক্ষ। সেই তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দিল্লীকে কেন্দ্র করে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সংখ্যা ৭০। এদের মধ্যে ১৮ জনের ব্যাপারে গোয়েন্দারা প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ করবার পর দেখেছেন মাত্র ৬ জন 'অযাচিতভাবে' তাদের বকেয়া কর মিটিয়ে দিয়েছেন।

আজ পর্যন্ত দিল্লীর এইচ এস বি সি শাখা যাঁরা কর দেননি তাঁদের নামের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সবমিলিয়ে ৪০ কোটি টাকার মতো রয়েছে। এর মধ্যে একেকজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টেই টাকা রয়েছে প্রায় ৭ কোটি থেকে ৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের বক্তব্য--- ''আমরা কেবলমাত্র দু'টি ক্ষেত্রে দেখেছি যে নিয়ম মেনে বকেয়া কর জমা দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ধরুন যে ৯৫ শতাংশ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে তার পুরোটাকেই কালো টাকা বলা চলে। আমরা এটুকু আশা করতেই পারি যাঁরা বিদেশের ব্যাঙ্কে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখছেন আমাদের এই চাঞ্চল্যকর খবর ফাঁস তাঁদেরকে ভক্তিতে না হোক ভয়ে অন্তত ভবিষ্যতে এনিয়ে কিছুটা নিবৃত্ত রাখতে পারবে।''

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আধিকারিকরা বলছেন এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায় করা সম্ভব হয়েছে এবং একবার এই পুরো আদায়-প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হবার পর ভারতীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে কর-ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কের যাবতীয় তথ্য যোগাড়ের কাজে লাগানো হবে।

তবে তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন যে এই কাজটা আদৌ সহজ নয়। কারণ ওই ৭০০টি কেসের মধ্যে তৃতীয়টি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে যাবতীয় তথ্য মিলছে না একেবারেই। ফর্মে যেসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা হলো অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম, স্বত্বাধিকারী, যিনি অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন তাঁর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাঙ্কারের নাম, অ্যাকাউন্ট খোলা ও বন্ধের দিন এবং ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স (২০০৭ পর্যন্ত, যদিও সব ক্ষেত্রে নয়)। কিন্তু সেই ফর্মের কোথাও না অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, না স্বত্বাধিকারী কারুরই সইয়ের কোনও বালাই নেই। আর এটাই অপরাধী চিহ্নিত হলেও ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে গোয়েন্দারা মনে করছেন।

একারণেই তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রথমে সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে যাদের অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য ফ্রান্স থেকে পাওয়া সহজলভ্য হবে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ব্যাঙ্ক লেনদেনসহ সমস্ত রকম তথ্য যোগাড় করার জন্য তাঁরা এইচ এস বি সি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলে কর্তৃপক্ষ তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেন।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তার সমস্ত গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে যে তাঁদের গোপনীয় ব্যাঙ্কিং তথ্য লঙ্ঘিত হতে পারে সংস্থার-ই এক প্রাক্তন কর্মচারী তথ্য চুরি করে নেওয়ায়!

জাঁকজমকের সঙ্গে জম্মুতে ভারতভুক্তি দিবস

সংবাদদাতা ॥ উৎসবের আমেজে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জম্মু- কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় (বিশেষত জম্মুতে) ধুমধাম সহকারে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি দিবস পালিত হয়। ১৯৪৭-এর ২৬ অক্টোবর মহারাজা হরি সিং ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছিলেন। সেই হিসেবে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত বছরই মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরের ভারতে 'অ্যাকসেশন' শব্দটি নিয়ে এক মন্তব্য করেছিলেন। তাই নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠে। অন্যান্যবারে বিক্ষিপ্তভাবে পালিত হোত, এবার তা হয়নি। আগে কেউ কেউ বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করত। এবার জম্মু বার এসোসিয়েশন হাইকোর্ট চত্বরে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করেছিল। অনেক সংখ্যায় বার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা যোগ দেন। বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বি এস সালথিয়া সদস্যদেরকে এই দিনটির বৈশিষ্ট্য, রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যারা এনিয়ে বিতর্ক করেন তাঁরা দেশের সংবিধানকেই বিতর্কে ফেলে দেন। সঞ্জীবনী সারদা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে বিজেপির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারতভুক্তি আর সম্মিলিত হওয়া এক নয়।

তৃণমূলের ‘সুসময়’ কতদিন চলবে তা সময়ই বলবে

গূঢ়পুরুষের

কলম

আগামী ৩০ নভেম্বর, বুধবার দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই কেন্দ্রটি সাম্প্রতিককালে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক বলে চিহ্নিত। তাই দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত বক্সি যে বড় ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীকে হারাবেন এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে ছোট বড় সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই একটা সুসময় থাকে। এই সুসময় কোনও দলের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আবার ক্ষণস্থায়ীও হয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম অথবা বামজোট দীর্ঘস্থায়ী জনসমর্থনের জোয়ারে ভেসেছে। অথচ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বামপন্থীদের এমন ভাল সময় থাকার কথাই নয়। দল এবং দলদাসদের অত্যাচারে বাংলার মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। তবু নির্বাচনে বামপ্রার্থীরা অতি সহজেই বারবার জিতেছে। জনসমর্থন ছাড়া শুধুমাত্র রিগিং করে এতবার নির্বাচনে জেতা যায় না। ক্ষমতায় থাকার ৩৫ বছরে বাম সরকার পশ্চিমবঙ্গকে রসাতলে নিয়ে গেছে। তবু নির্বাচনে জেতা আটকায়নি। আমি একেই সুসময় বলছি। আবার প্রয়াত নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কংগ্রেস একদা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছিল। অজয়বাবু ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর গড়া দলের সুসময় ক্ষণস্থায়ী ছিল। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কেন্দ্রে বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ জোট সরকার যথেষ্ট ভাল কাজ করা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরেনি। অথচ কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথম ইউ পি এ সরকার ক্ষমতা দখলের পর একের পর এক আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মন্ত্রী-আমলারা আত্মসাৎ করেছে। এই অর্থ জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকা। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক দলকে (পড়ুন কংগ্রেস) ভোটদাতারা সমর্থন করে না। অথচ দেখুন সেই চোরেদের দলের জোটই দিব্যি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছে। একেই বলে সুসময়। হ্যাঁ, চোরেদেরও সুসময় থাকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সুসময় দীর্ঘস্থায়ী অথবা ক্ষণস্থায়ী হবে জানা নেই। তবে এই ব্যাপারে রাজনৈতিক চরিত্রগত কিছু কিছু লক্ষণ নিয়ে ভাবা যেতে পারে। যেমন, অতীতে দীর্ঘস্থায়ী সুসময়ের অধিকারী সিপিএম দলে গণতন্ত্র ছিল না। কম্যুনিস্টরা দলতন্ত্রে বিশ্বাস করে। দলের সর্বোচ্চ নেতাই শেষ কথা বলেন। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই শেষ কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের বৃন্দাবনে তিনিই একমাত্র পুরুষ। তাঁর ইচ্ছাতেই ঘাসফুলে বাহার আসে। বিবর্ণ হয়। তিনিই পরম পুরুষ! তাঁর শ্রীচরণে দলের নেতা-মন্ত্রী-কর্মী সকলেই আশ্রিত। সম্প্রতি কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ঘটা করে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন হয়েছে। সেখানে সর্বসম্মতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। হাস্যকরভাবে মিডিয়া এই খবরটিকে প্রথম পাতায় ছেপেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে দলের যে কেউ চেয়ারপার্সন পদে লড়তে পারতেন। কিন্তু তৃণমূলের কোনও নেতা বা নেত্রীর হিম্মত নেই মমতার বিরুদ্ধে দলীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। যেমন, স্তালিন বা হিটলারের বিরুদ্ধে একদা দলীয় নির্বাচনে লড়াইটা অসম্ভব ছিল। যেমন, সিপিএম দলের গঠনতন্ত্র, সংবিধান যাই বলুক না কেন প্রকাশ কারাত, বিমান বসুদের দলীয় নির্বাচনে বিরোধিতা করাটা তলার সারির নেতারা ভাবতেও পারেন না।

‘আমরা-ওরা’ এবং দলতন্ত্রের বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল মহাকরণ দখল করেছে। বাস্তবে কিন্তু সেই একই ‘আমরা-ওরা’র রাজনীতিই রাজ্য প্রশাসনে চলছে। শুধু রং বদল হয়েছে। লালের পরিবর্তে সবুজ হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়েছে প্রশাসন। লাল ঝাণ্ডা হাতে দাপিয়ে বেড়ানো কমরেডদের বদলে এখন সরকারি অফিসে, হাসপাতালে, পথেঘাটে দাপাচ্ছে সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে মাস্তান বাহিনি। কোথাও চরিত্র বদল হয়নি। তবু ভোটে বিপুল সাফল্য পাচ্ছে তৃণমূল। কেন? কি ভাবে? আমার জানা নেই। শুধু বলতে পারি, সু-সময়ে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমড়া গাছে ল্যাংড়া আমও ফলে।

কম্যুনিস্টরা দলতন্ত্রে বিশ্বাস করে। দলের সর্বোচ্চ নেতাই শেষ কথা বলেন। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই শেষ কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের বৃন্দাবনে তিনিই একমাত্র পুরুষ।

বিমান বসু : জননীর জঠরের লজ্জা

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতির অঙ্গনে নেতা-নেত্রীদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে যে এই বিশাল বিশ্বে যেন আমিত্বের বড়াই চলছে।

সিপিএমের রাজ্য-কমিটির সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু কংগ্রেস-তৃণমূল সম্পর্ক নিয়ে কুৎসিত-অঙ্গভঙ্গি এবং কু-কথা বললেন, আবার ক্ষমাও চাইলেন। এই নেতা যদি কর্মীদের সু-আচরণ করার উপদেশ দেন তাহলে তো নিচের তলার কর্মীরা তো বলতে পারেন— 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও।' সিপিএমের নিচেরতলার কর্মীর খিস্তি-খেউড় করায় অভ্যস্ত এবং উদ্ধত। তাদের এক বিশিষ্ট নেতা বক্তৃতায় বলেছিলেন— ''আমরা ২৩৫, বিরোধীদের মাথা ভেঙে দেব।'' এর সঙ্গে বিনয় কোঙারের অশালীন উক্তি এবং গৌতম দেবের বুকনিবাজি— পার্টি কর্মীদের এই পথেই পরিচালনা করবে।

এ-রাজ্যের সিপিএমে এক নৈরাজ্য চলছে। কোনও নেতার নেতৃত্ব কোনও স্তরে মানছেন না কেউ-ই। রাজ্য-স্তরে রেজ্জাক মোল্লা 'প্রথম মুসলমান সংগঠন' গড়ার দিকে এগোচ্ছেন। ভোটই তো পরম মোক্ষ এবং লক্ষ্য! তাই মুসলমান তোষণ করে মুসলমান ভোট কুড়োনোর নিন্দনীয় প্রচেষ্টা। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পার্টিতে অমিতাভ নন্দী এবং তড়িৎ তোপদারের গোষ্ঠীবাহিনীর লড়াই তুঙ্গে। অমিতাভ নন্দী তাড়াচ্ছেন তড়িৎবরণদের এবং একই ভাবে তড়িৎ সরাচ্ছেন অমিতাভদের। এই নেতারা জানেন না যে নিচের তলার কর্মীরা তাঁদের দেখে উৎসাহিত হবেন। যেমন— বুদ্ধ- বিমান- নিরুপম-বিনয়-গৌতম শীর্ষে থাকলে এ-রাজ্যের সিপিএম কর্মীরা উদ্দীপিত হবেন না। লক্ষ্য করার বিষয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত বলেছেন— ''কেরলের পার্টির উদাহরণ নেওয়া দরকার, তারা প্রশাসনে থেকেছে, হেরেছে; তাই সংগ্রামী মনোভাব ভোঁতা হয়নি। আর পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সংসদীয় প্রশাসনের পাঁকে পড়ে আর উঠতে পারছে না। সিপিএমের পলিটব্যুরোতে আদর্শগত দলিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৬৯ সালের বর্ধমান প্লেনামে নাগি রেড্ডি এবং পুল্লা রেড্ডিদের চীনা লাইনের বিরোধিতা করে দলিলটি গৃহীত হয়েছিল। আজ আর সে অবস্থা নেই। বিশ্বে 'সমাজতান্ত্রিক শিবির' নেই। চীন- আমেরিকার মধ্যে বিশ্বে আধিপত্যের লড়াই চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শগত দলিল আলোচনা হচ্ছে। বুদ্ধবাবুর এক কথা— পার্টিকে উদার হতে হবে। বুদ্ধ-সমালোচকগণ তাঁকে নাকি ''নয়া গর্বাচভ'' বলছে বলে শোনা যাচ্ছে!

সিপিএমের নিচেরতলার কর্মীরা পার্টি নেতৃত্বের দায়ভার নিতে চাইছেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কান্তি গাঙ্গুলির এনজিও নিয়ে এবং তাঁর রূঢ় আচরণ নিয়ে কথা উঠেছে। এখানে সুজন চক্রবর্তী ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছেন। পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিলেন— ''আর একবার মূল্যবৃদ্ধি হলে সমর্থন তুলে নেবেন''। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সিদ্ধান্তে অটল— কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় সরকার বাঁচাতে তৃণমূলকে তুষ্ট রাখতেই হবে। এটাই শরিকি ব্যবস্থার ফল।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি কাজে 'অতি' তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যপাল তাঁকে বাহবা দিচ্ছেন। জঙ্গলমহলের সভায় জঙ্গলমহলের মন্ত্রী সুকুমার হাঁসদা, সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী এবং বাঁকুড়ার প্রবীণ বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্র আমন্ত্রিত হননি। শুভেন্দু অধিকারী নিজস্ব কায়দায় সভা-সমিতি করে নিজের রাজনৈতিক জমি শক্ত করছেন।

সম্প্রতি ভবানীপুর থানায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু 'দুষ্কৃতী'কে ছাড়িয়ে এনেছেন। এই হাঙ্গামায় পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট— পুলিশের মধ্যে অন্তর্দলীয় তীব্রতা সৃষ্টির ব্যবস্থা হলো না কি? রাজ্য-কংগ্রেসের অবস্থা বড়ই করুণ! প্রদীপ ভট্টাচার্য, দীপা দাসমুন্সি ও অধীর চৌধুরীরা চীৎকার করছেন। মন্ত্রী ইয়াসমিন তো মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চাইছেন— কারণ তিনি নাকি অবহেলিত!

বিধানসভাগুলির আগামী নির্বাচন শেষ হবার পর কেন্দ্রীয়ভাবে ইউপিএ ডুবে যাবে। কংগ্রেসের অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উক্তি— ''যদি চারটি রাজ্যে শাসনে থেকে অল-ইন্ডিয়া পার্টি হয়, তবে আমরা তো আগামীদিনে চারটি রাজ্যেও স্থান করবো।'' এটি তো প্রচ্ছন্ন হুমকি বলে মনে করছেন রাজ্য-কংগ্রেসের নেতারা।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ খুলেছেন মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেছেন ''শীতের সবজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আমাদের নেই। বাজারই বাজার দর ঠিক করবে।'' ধানের দর পড়ে যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ধান-চাষিরা। কংগ্রেস এবং সিপিএম বলছে— ''ধান কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা খরচ করা হচ্ছে না কেন?'' কেউ কেউ বলছেন সে টাকায় অন্য কাজ হচ্ছে? আলু উৎপাদনকারীদের গলা টিপছে মাঝের ফড়েরা। এ অবস্থা ৩৪ বছরের বাম-রাজত্বে চলেছিল।

ঢাকঢোল পিটিয়ে কলকাতা ফিল্ম উৎসব শুরু হলো। এবারের বৈশিষ্ট্য হলো আমজনতাকে নিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো এবং কিছু শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো। এটা নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে এই উৎসব হচ্ছে। অথচ সরকারি শিক্ষক-পরিবহণ কর্মীদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাজভবনে বা দিল্লিতে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাতে রাজ্য-অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ব্রাত্য থেকে গেছেন এবং তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জনসভায় গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করছেন। এটি কি আলোচনা শীলিত? উল্লেখ করা যেতে পারে পুরুলিয়াতে মৃতপ্রায় লাক্ষা শিল্প উজ্জীবনের কথা কি সেখানকার সভাতে ঘোষিত হয়েছে? লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা আছে। সেটার কর্তা এক সময়ে ছিলেন সুখেন্দু মজুমদার। তিনি কংগ্রেস নেতা প্রয়াত অশোক সেনের জামাই এবং প্রাক্তন কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা। তবে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে এক ধর্মীয় পরিবেশে দিন কাটাতেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা সরকারি হাসপাতালগুলিতে ক্রমশ এক নৈরাজ্যের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, এর মূল কারণ অবশ্য বামফ্রন্টের শাসনের ফল। তথাপি সুষ্ঠু সমন্বয় কি দরকার নেই?

মমতা দেবী মাওবাদী এবং মাওবাদী সমর্থক কলকাতার সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক কথা বলেছেন। বলছেন, যৌথবাহিনীর পাল্টা আক্রমণকে তীব্র করা হবে। শাসনকালে বুদ্ধদেববাবুরা তো এই কথা বলেছিলেন। তখন মমতা দেবী বলেছিলেন— 'কোনও মাও-ফাও নেই— যৌথবাহিনী প্রত্যাহার চাই।' একটা কথা উল্লেখ করে এই লেখার উপসংহার করতে চাই— গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চীন সফরে চীনা রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে ভারতের আগামীদিনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কমিউনিস্টরা তো নরেন্দ্র মোদীকে 'খুনী' বলেন!

এবার তাঁরা কি বলবেন? বলার কি আদৌ কিছু আছে?

একঘরে সিরিয়া

অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরবার আরব দুনিয়া। গত ১২ নভেম্বর আরব লীগের ভোটাভুটিতে স্থির হয় আগামী দিন চারেকের মধ্যে সিরিয়াকে 'সাসপেন্ড' করা হবে এবং আগামীদিনে 'একঘরে' করে দেওয়া হবে যদি সরকার তার বিরোধী পোস্টার মারার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলিচালনা বন্ধ না করে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি বেশ ক'টা দিন কেটে গিয়েছে। কায়রোয় আরব-দুনিয়ার তাবড় ১৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিদেশমন্ত্রীদের আলোচনা ও ভোটাভুটির পর কাতারের বিদেশমন্ত্রী হামিদ বিন জাস্সিমের এহেন হুমকির পরও সিরিয়া সরকারের এনিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল আছে বলে মনে হচ্ছে না। সৌদি আরবের সাদ্দাম হুসেন থেকে লিবিয়ার গদ্দাফি— একনায়কতন্ত্রের অবসানে সেদেশের মানুষের আন্দোলন নতুন কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে মার্কিন ইন্ধন আরব দুনিয়ার চক্ষুশূল হয়ে ওঠায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরব লীগের পাত্তা পায়নি। তবে আরব দুনিয়ায় অত্যাচারী শাসকের ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত থাকলেও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসসাদ হঠাৎ আরব লীগের কোপে পড়লেন ঠিক কি কারণে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে।

পাক দ্বিমুখী বাণিজ্য-কৌশল

পাকিস্তান তার দেশের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করলো ভারতের বস্ত্র এবং চর্ম কারখানা থেকে অত্যাবশ্যকীয় মেশিনারি এবং কাঁচামাল

কিনতে! খবরটি একনজরে দেখে ভূতের মুখে রাম-নামের মতোই মনে হতে পারে। তবে দেশের কূটনীতিকরা এরমধ্যে দ্বিমুখী বাণিজ্যের কৌশল এবং তার জন্য পাকিস্তানের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছেন। কারণ পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ২৩৩টি স্পর্শকাতর 'আইটেম'-এর উল্লেখ করেছে, মূলত বস্ত্রশিল্পের জন্য, যেগুলি নিয়ে ভারতের সঙ্গে খোলা বাণিজ্য করার আইনত উপায় নেই। অন্যান্য বাণিজ্যিক লাইন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি অবশ্য হতে কোনও বাধা নেই। আর এখানেই বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে পারে পাকিস্তান। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক আবহাওয়া এখন চূড়ান্ত উত্তপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও দ্বিমুখী বাণিজ্য চালু করার ব্যাপারে পাকিস্তান যেভাবে গরজ দেখাচ্ছে, তা উদ্বিগ্ন করেছে দেশের কূটনৈতিক মহলকে।

স্বধর্ম রক্ষায়

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদের ওপর পাক-দুষ্কৃতকারীদের নাশকতার প্রতিবাদে মুখর হলো পাকিস্তান হিন্দু কাউন্সিল। গত ১২ নভেম্বর সেখানকার গণবিবাহ অনুষ্ঠানে স্বধর্ম ও স্বদেশ (সিন্ধুপ্রদেশ) রক্ষায় শপথ নেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে ৮০ জন দম্পতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি স্বধর্ম রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধও হন। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসনের সুস্পষ্ট মদতে হিন্দুদের ওপর দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালাচ্ছে বহুদিন ধরেই। কিন্তু হিন্দু সভ্যতা বিকশিত হওয়ার (যেমন সিন্ধুপ্রদেশ ইত্যাদি) প্রাচীন স্থানগুলিতে, যেগুলো আপাতত পাকিস্তানে অবস্থিত, হিন্দুরা সেখানে স্বধর্ম রক্ষায় রীতিমতো উদ্যোগ নিচ্ছেন। এই রেশ পাকিস্তানের অন্যত্রও হিন্দুদের স্বধর্ম রক্ষায় উৎসাহিত করবে বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল আশাবাদী।

একি শুনি আজ!

একি শুনি আজ মন্থরার মুখে! জাতপাতের অভিসম্পাত দূরীকরণ যাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না, ছিল কেবল সেই অভিশাপকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পর্যবসিত করা। আর সেই হাতিয়ার যে কতটা শক্তিশালী হতে পারে গত উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন ভারতবাসী। বুঝতেই পারছেন, 'দলিত' নেত্রী মায়াবতীর কথা হচ্ছে যিনি স্রেফ দলিত ভোটে'র ওপর ভর করেই বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে উত্তরপ্রদেশের তখতে বসেছিলেন। গত ৫ বছরে আত্মপ্রচারের অপার মহিমায় সেই দলিত ভোট ব্যাঙ্কে আজ ধস নেমেছে। এবং শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে মায়াবতীর দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত ব্রাহ্মণ নেতা সতীশ চন্দ্র মিশ্র রাজ্য-রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এর বুকে ব্রাহ্মণ সম্মেলন করেছেন গত ১৩ নভেম্বর এবং সেই সভায় ব্রাহ্মণদের পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে' তাতে যোগদান করতে বলেছেন স্বয়ং দলিত নেত্রী মায়াবতী। তখতে বসার থেকেই ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের সঙ্গে আপসে মীমাংসা করে নিতে একপ্রকার আগ্রহী-ই ছিলেন মায়াবতী। কিন্তু নিজের কৃতকর্মের জন্য ভুল স্বীকার— তা এতদিন অভূতপূর্ব-ই ছিল বটে! ভোট তো কত কিছুই ভুলিয়ে দেয়! তবে খেটে খাওয়া, নুন আনতে পান্তা ফুরোনো উত্তরপ্রদেশের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষেরা স্বপ্নভঙ্গ আর নেত্রীর ভোল-পাল্টানোর যন্ত্রণা সইতে না পারলে আসন্ন ভোটে কপালে দুঃখ আছে মায়াবতীর। কারণ এ্যাদ্দিন বহু যন্ত্রণা সওয়া তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভবীও যে ভোলবার নয়। তাই তথাকথিত উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্ব ভুলে অখণ্ড হিন্দু-সত্তা জাগরণের দিকেই. তাকিয়ে আজ উত্তরপ্রদেশ।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ রুখতে চাই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

সারস্বত সাধনার দ্বারা হিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীকে, গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে ও হিন্দী সিনেমার মধ্য দিয়ে হিন্দু সর্বসাধারণকে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি আবেগমোহিত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে ছিল ধর্ম ও সমাজ। পরিবার প্রথাকে দুর্বল করে দিয়ে হিন্দু সমাজকেই আঘাত করার প্রচেষ্টা চলছে, এর ফলে ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতাকে কেন্দ্রে রেখে এক নির্লিপ্ত হিন্দু সমাজের আবির্ভাব হচ্ছে। যে পারিপার্শ্বিক জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে দেখেও নিশ্চুপ।

সিংহবাহিনীর আবাহনের পূর্বে বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে মধ্যপন্থী নেহরুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অঙ্গ হিসাবে দেবী দুর্গার বিবিধ নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পূজার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কেউ কেউ তাঁদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। ভুলেও বলেননি কেন কোন ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ মিশরীয় দেবী 'কুদশু' থেকে সুমেরীয় দেবী 'ইনান্না' স্মৃতির অন্তরালে চলে গেছেন? কেন মধ্যএশীয় দেবী 'কুবিলি' ইতিহাসের পাতায় থাকলেও সে সকল দেশের মানুষের হৃদিমন্দির থেকে হারিয়ে গেছেন? কোনও দর্শন মূর্তি ভাঙ্গাকেই ধর্মের পুণ্য কার্যের মধ্যে স্থান দিয়েছে। সেই ধর্মই মূর্তি ভাঙ্গাকে বিধিসম্মত করেছে ও ধর্মান্তর, সে যে ভাবেই হোক, তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে। সাদাসিধে মিশুকে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার মানুষকে হিংস্র সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠার পথে পাথেয় কোন ধর্মদর্শন, সে গভীর আলোচনায় মধ্যপন্থী বহুল প্রচারিত গণমাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই যায়নি। গেলে হিন্দুকে দোষারোপ করে জ্ঞান দেবার সারা বছরের ক্রিয়াকর্মটি বৃথা হয়ে যেতে পারে! সন্ত্রাসবাদের মূলে যে মানসিক অসুস্থতা আছে সেটি জেনেও চুপ থাকতে শিখতে হবে কারণ ভোটে জিততে হবে, ক্ষমতায় থাকতে হবে, অর্থ রোজগারে মনোযোগী হতে হবে মধ্যপন্থী ধর্মে অরুচি নেহরুবাদের ভক্ত রাজনৈতিক শক্তিকে। ৬৪ বছরের স্বাধীনতা-উত্তরকালের ৫৪ বছর ধরে যাঁরা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করলেন তাঁরা যখন অন্যের সমালোচনা করেন তখন মানায় কি? ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়টা সবচেয়ে বেশি কার বুঝতে অসুবিধা হয় কি? দারিদ্র্য ও দুর্নীতি, এই দুই শনি কার যত্নে আজ দেশটাকেই গ্রাস করতে চলেছে সেটা কারুর অজানা কি?

ভোগী হতে হবে যোগী হওয়ার দরকার নেই। এই মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদী আকুতিটি বুঝতে শিখতে হবে। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে তাঁরা কোনওদিনও ভাবিত ছিলেন না, আজও নেই। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটার গুরুত্ব ছিল। অবশ্যই সে সংগ্রামের পুণ্য-মাতৃমন্দিরের বেদীতলে যাঁরা প্রাণ আহুতি দিলেন ক্ষমতায় তাঁরা এলেন না। সন্ধি করে যে স্বাধীনতা এলো, যাঁরা ক্ষমতায় এলেন তাঁরা Voice of India-র প্রতিনিধি! ভারতের সুপ্রাচীন মহাওঁঙ্কার ধ্বনিকে তাঁরা অবজ্ঞা করলেন। যাঁরা সর্বসময় আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে বিশ্বসংসার কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা হিন্দুর শঙ্কার কথাটি বোঝার চেষ্টাও করেন না। বিশ্বের ৩৪ শতাংশ মানুষ খৃস্টান, ২২ শতাংশ মানুষ মুসলমান। তাঁরা প্রায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। ইউরোডলার ও পেট্রোডলারের মালিক। তাঁদের পক্ষে লেখার লোকের অভাব নেই। মিডিয়া তাঁদের অধীনে। অধিকাংশ সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের নীতি নির্ধারিত হয় এঁদের অর্থ শক্তি দিয়ে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও পরোক্ষভাবে। নিরপেক্ষ-মিডিয়া কথাটি সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক। প্রচারের জন্য বহুল প্রচারিত পত্রিকা ওটা বলে, মনে মনে সত্যটি তারাও জানে। ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ভারতবর্ষকেও গ্রাস করার ছলকল চলছে। বিশ্বের ১৪ শতাংশ মানুষ হিন্দু, প্রায় ৭ শতাংশ মানুষ বৌদ্ধ ও ১ শতাংশ মানুষ শিখ, জৈন এই সকল আর্য ধর্ম সংস্কৃতির ধারক ধর্মগুলির উপাসক। আর্য ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন আত্মরক্ষার্থে। তা নাহলে সেমেটিক ধর্ম-সংস্কৃতি গ্রাস করে নেবে আর্য-ধর্ম-সংস্কৃতিকে। বিশ্বের আঙ্গিকে সংখ্যালঘুর মানসিক কম্পন তো হিন্দুর মনে। কারণ একের পর এক রাষ্ট্রে বর্বরতার সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে আঘাত করা হয়েছে। মধ্য এশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সকল স্থানেই হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে ইসলামী আগ্রাসনবাদ তার ধ্বজা তুলেছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে ৭০ শতাংশ বিশ্বের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ হয় হিন্দু, নয় বৌদ্ধ ছিলেন। ইতিহাস আলোচনা করলেই সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে আসল নিয়মেই।

আফগানিস্তানে সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করা হয়েছে, বাংলাদেশে হিন্দুর জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে, পাকিস্তান হিন্দু-শূন্য হতে চলেছে, বিপদ এগিয়ে আসছে ভারতে। পূর্বভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে দিয়েছে বহু জেলায়। কেরালায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে অদূর ভবিষ্যতে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়ে হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারিয়ে ছিল আগেই। মণিপুরও যোগ হতে চলেছে এই সারিতে। কাশ্মীর হিন্দু-শূন্য হয়ে গেছে প্রায়। হিন্দুদের ভারতেই অন্যান্য রাজ্যে

শরণার্থী হয়ে থাকতে হচ্ছে। অতি উদারবাদীরা তাকিয়ে আছেন উন্নত বিশ্বের দিকে। সেখানেই তাঁদের চিত্ত। তাই ভারতবর্ষ বেহাত হলেও ইউরোপ-আমেরিকায় বসে জ্ঞান বিতরণের সুযোগটা তো থাকবে! যদিও সে জ্ঞান কেউ গ্রহণ করবে কিনা সে কথা ভিন্ন। কারণ হিন্দুর হাতের থেকে শাসনদণ্ড চলে গেলে সেই আত্মঘাতী জ্ঞান নেবার ইচ্ছে অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী মানুষের হবে না। অবশ্য যখন যেমন তখন তেমন করে নিজেরটা গুছিয়ে নেবার ধারাটা করে খাওয়ার রাজনীতিটা অতি উদারবাদীরা ভালই বোঝেন। তাই সে সময় ধর্মান্তরিত হয়ে খৃস্টান বা মুসলমান হয়ে যেতে তাঁদের একটুও সময় লাগবে না। ধীরে সেজেগুজে গাড়ী চালিয়ে বা বাড়িতে পাদ্রী বা মৌলবী ডেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবেন তাঁরা। যে বিপুল সম্পত্তি তাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঁকাপথে করেছেন তা যদি ধর্ম দিয়ে রক্ষা করা যায় তাতে তাঁরা একদমই পিছুপা হবেন না। নিরীশ্বরবাদীদের কাছে তা ধর্ম পরিবর্তনও মনে হবে না। নাম পরিবর্তন মাত্র। ত্রিবর্ণের রাষ্ট্রীয় পতাকার মধ্যে সবুজে সুবজ হয়ে মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদীদের আনন্দ দেখেননি? গেরুয়া রঙের প্রতি তার সিকিভাগও দেখেছেন কী কখনও? এঁদের বুদ্ধদেব থেকে বাহারউদ্দিন হতে কোনও সময় লাগবে মনে করছেন? অবলীলাক্রমে মুসলমান হয়ে যাবে। সংস্কৃত ভাষায় পূর্বপুরুষ বই লিখেছে বলে কাব্য করে যাঁরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা দেখিয়েছেন তাঁদের চিনে নিতে হবে। এঁদের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ ও উর্দুকে নিয়ে আদিখ্যেতার বিপরীতে টোলের পণ্ডিতদের প্রতি অসম্মান, তাঁরা অভুক্ত থেকে স্বর্গারোহণ করুন কিংবা ভেসে যান ক্ষতি নেই। মৌলবী সাহেবরা মাইনে পান! গরীব মুসলমান ছেলেরা বৃত্তি পান কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতরা, গরীব হিন্দু ছেলেদেরও একই সুযোগ-সুবিধা দিতে অসুবিধা কোথায়? হিন্দুর ছেলেকে মাদ্রাসায় যাবার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে নিঃশব্দে। টোল তুলে দিয়ে গরীব হিন্দু সন্তানও যাতে মাদ্রাসায় যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে ধীরে ধীরে। অনেক জায়গায় মাদ্রাসায় গরীব হিন্দু সন্তানের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। সমূহ বিপদ তাতে। পরবর্তীকালে এই ছাত্রদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর করার ক্ষেত্রটি তৈরি করে রাখা হচ্ছে শিশুকাল থেকেই। যেমন হিন্দু-অহিন্দু বিবাহে হিন্দুকেই সিংহভাগ সময়ে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়। এমনকী খণ্ডিত ভারতবর্ষেও। নিশ্চুপ থাকে সমাজ। নীরব থাকে তথাকথিত বহুল প্রচারিত গণমাধ্যম। ঘুমন্ত হিন্দু জাতি জাগ্রত না হলে আরও আঘাত আসবে, ইতিহাস সে কথাই বলছে।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল দেশের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রগুলোকে দখল করে নিরীশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। সুদীর্ঘ ৬৪ বছর স্বাধীনতা উত্তরকালে নেহরু সরকারের সময়কাল থেকে মধ্যপন্থী শাসনকালে পশ্চিমঘেঁষা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীদের দেশের সরকারি অর্থব্যয়ে পশ্চিমী মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদ ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গি যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় তারজন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন মূল সংবিধানের সংশোধন করে জরুরী অবস্থার সময় 'সেকুলার' শব্দটি সংবিধানে ঢোকানো হয়। এরপর বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমের দখল নিয়ে হিন্দু সমাজকে ভোগবাদের মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত করার চেষ্টা চলছে। যাতে সমগ্র সমাজটাকেই সাহেবদের মতো সাজিয়ে নেওয়া যায়। বিনোদন জগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী হিন্দী সিনেমাতে যবনদের প্রতিপত্তি ও স্পর্ধাপূর্ণ উপস্থিতি এখন প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে সারস্বত সাধনার দ্বারা হিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীকে, গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে ও হিন্দী সিনেমার মধ্য দিয়ে হিন্দু সর্বসাধারণকে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি আবেগমোহিত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে ছিল ধর্ম ও সমাজ। পরিবার প্রথাকে দুর্বল করে দিয়ে হিন্দু সমাজকেই আঘাত করার প্রচেষ্টা চলছে, এর ফলে ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতাকে কেন্দ্রে রেখে এক নির্লিপ্ত হিন্দু সমাজের আবির্ভাব হচ্ছে। যে পারিপার্শ্বিক জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে দেখেও নিশ্চুপ। অবৈধ অনুপ্রবেশ যে দরিদ্র মানুষের রোজগারে সবচেয়ে বেশি ভাগ বসাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে অর্থনীতি তা বুঝেও তারা নির্বাক। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি যে সার্বিক সর্বনাশ ডেকে আনছে তা অনুধাবন করেও যাঁরা এটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাঁদের বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসছে কোন মোহে কে জানে! সন্ত্রাসবাদ আঘাত হানছে বার বার, ভারতমাতার হৃদপিণ্ডে যেমন হানাদার বিদেশী যবন এনেছিল মধ্যযুগে। হিন্দু সমাজকে বুঝতে হবে ক্লীবত্বকে প্রশ্রয় দিচ্ছে মধ্যপন্থা। ভারতে দাঁড়িয়ে হিন্দু মেয়ে অহিন্দু ছেলেকে স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনও মুসলমান, খৃস্টান মেয়ে বিবাহের জন্য ধর্ম পরিবর্তন করে কদাপি। হিন্দু সমাজের অসংগঠিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুর মনের কথা বোঝার কোনও সদিচ্ছাই দেখাচ্ছে না। কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান মেয়ে পাকিস্তানে স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে হিন্দু উচ্চবংশজাত সন্তানকে বিবাহ করছে এটা ভাবা যায়? কিন্তু স্বনামধন্য ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে ভারতে দাঁড়িয়ে মুসলমান হয়ে নবাবকে বিবাহ করেছে যদিও সামাজিকভাবে হিন্দু নামটি রেখেছে পেশার স্বার্থে। মধ্যপন্থা এটাই শেখায় হিন্দু তার ধর্ম নিয়ে উৎসাহ হারিয়ে সাহেব হবার সাধনায় রত হোক। প্রচলিত উদারবাদী পত্রপত্রিকা এই ভাবটিকেই সমর্থন করে। তাই রাষ্ট্রবাদী পত্র-পত্রিকার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে হিন্দু ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে। তাঁদের যদি আর্থিক সংগতি থাকে সে অর্থ লগ্নি করুন রাষ্ট্রবাদী শক্তিশালী মিডিয়ার জাগরণে। মন্দিরের অর্থ যাতে হিন্দুর স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা সযত্নে লক্ষ্য রাখুন। অহিংস আন্দোলনে প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই রাষ্ট্রবাদী প্রচারমাধ্যমে অর্থলগ্নি জরুরী ভদ্র অহিংস হিন্দুত্ববাদী জনজাগরণে। বৃটিশ রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয়ত্বে ভাস্কর হতে হবে আমাদের শিবমন্ত্রে, সত্যের পথে, ধর্মের রথে।

আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের মাধ্যমে চৈতন্যে উত্তরণ, অন্তরের মধ্যে অন্তরতরকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জগতের আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষায় ব্রতী হবার উপাসনাকে গুরুত্ব দিতে গেলে নিজের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার শিক্ষা দরকার যা দেওয়া হলো না স্বাধীনতা উত্তরকালে। ভোগসর্বস্ব ভোগান্তি সংসারকে শ্মশান করে দিয়েছে, অশান্তির বহ্নিশিখায় বাঁচার আনন্দ অশ্রুসাগরে বিসর্জিত হচ্ছে, সাংস্কৃতিক দাসত্ব স্বাভিমানের মেরুদণ্ডটিই ভেঙ্গে দিয়েছে, ভাবনার ভরকেন্দ্রটি ভারত থেকে ইউরোপগামী হয়েছে। সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''কোথায় আছে সেইসব মানুষ, যারা ভারতের মহান ঋষিদের চিন্তারাশি পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বহন করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত? কোথায় সেইসব মানুষ, এই মহান বাণী পৃথিবীর প্রতিটি গৃহকোণে পৌঁছে দেবার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত? সত্যের প্রচারের জন্য, বেদান্তের সত্যগুলিকে দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য এই রকম বীর-কর্মীরই প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার আদর্শ না পেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।...এখন সময় এসেছে এমন চেষ্টা করার, যাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবরাশি পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে।... আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা জগৎ জয় করতে হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে; নচেৎ মৃত্যু। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'' তাই ওঁঙ্কারের ঝংকারে ভারতকে সুসংগঠিত করে Integrated Humanism and Vedantic Socialism এর পথ ধরেই আসবে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ যার তত্ত্বের কেন্দ্র রয়েছে সবার মধ্যে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে শিবকে সাধনার মাধ্যমে দর্শনের শিক্ষা।

দেশীয় রাজ্যগুলি সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে

অটোভন বিসমার্কের সঙ্গে প্যাটেলের তুলনা সামঞ্জস্যহীন

অতিথি কলম

প্রফুল্ল গোরাডিয়া

৫৬০ জন রাজন্যবর্গের অনুগত রাজ্যগুলিকে স্বাধীন ভারতের ছত্রছায়ায় অন্তর্ভুক্ত করার দুরূহতম কাজটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল করেছিলেন নিপুণতম দক্ষতায়। তাঁর এই কর্মকাণ্ড ইতিহাসে বিরল, সেখানে জার্মানির ওটো ভন বিসমার্কও তুলনায় আসেন না। প্যাটেলের এই অক্লান্ত ও নির্ভীক প্রচেষ্টা ছাড়া আজকের আধুনিক ভারত ছিল কল্পনার অতীত।

ভারতবর্ষের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে অনেকেই দুই জার্মানির মিলনকর্তা অটো ভন বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা

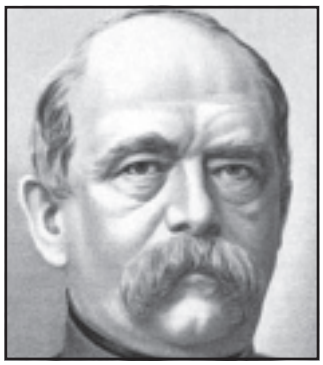

অটোভন বিসমার্ক

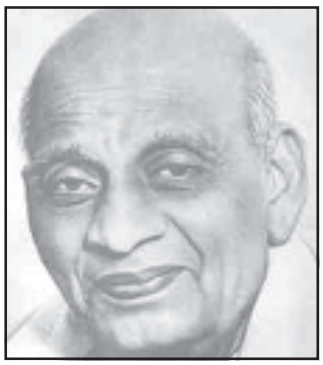

সর্দার প্যাটেল

করে থাকেন। বিসমার্ক ১৮৭১ সালে তৎকালীন বিভক্ত জার্মানিকে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে সংযোজিত করেছিলেন। সম্প্রতি শ্রী বলরাজকৃষণ তাঁর গ্রন্থে সর্দার প্যাটেলকে 'ভারতের বিসমার্ক' খেতাবে ভূষিত করেছেন। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এই সাম্মানিক খেতাব সর্দারের কীর্তিকে খাটোই করেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কাল বা তৎপরবর্তী বিক্ষুব্ধ সময়সীমার প্রেক্ষাপটে সর্দার প্যাটেলের ভূমিকার পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে অনায়াসেই দেখা যাবে যে অটো ভন বিসমার্ক কেই 'জার্মানির প্যাটেল' বলা যুক্তিসঙ্গত।

১৮৬১ সালে তৎকালীন প্রুসিয়ার চ্যান্সেলার নিযুক্ত হওয়ার পরেই তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এদিকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির ফলস্বরূপ ১৮৬৬ সালে তিনি আবার অস্ট্রিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে তৎকালীন উত্তর-জার্মানির চারটি নগরাঞ্চল প্রুসিয়ার অধিকারে আসে।

অন্যদিকে তখন বাকি ছিল দক্ষিণ জার্মানির চারটি বড় রাজ্য, যারা প্রুসিয়ার বশ্যতা স্বীকার করেনি। বিসমার্ক দেখেছিলেন এই চার বড় রাজ্যের সংযুক্তিকরণ ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ানকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে না পারলে সম্ভব করা যাবে না। বিসমার্ক নেপোলিয়ানকে (তৃতীয়) প্ররোচিত করে জার্মানির ওই চারটি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করেন। ফলস্বরূপ ওই চারটি রাজ্য আক্রমণ প্রতিহত করতে তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও বৃহৎ প্রুসিয়ান সাম্রাজ্যের সঙ্গে হাত মেলায়। যার ফলেই ১৮৭১ সালে সফল হয় জার্মানির একীকরণ। আদতে এটি ছিল প্রুসিয়া ও তুলনায় ছোট ২১টি নগরের সংযুক্তি যার জনসংখ্যা ছিল মাত্র চার কোটি ও এলাকা ছিল তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্দার প্যাটেলের চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বড়। কেননা দেশীয় রাজাদের দ্বারা অধিকৃত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির পর দেখা যায় ভারতবর্ষের আয়তন তেত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আর জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটি। ভাবলে অবাক হতে হয় সেই সময় (স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে বা পরে) দেশীয় রাজার সংখ্যা ছিল ৫৬০। কেউ বড়, কেউ মাঝারি, আবার কেউ বা খুবই ছোট। তবে এদের সবাইকেই ভারতমাতার এক ছত্রছায়ায় আনার ব্যাপারটা মোটেই হেলাফেলার ব্যাপার ছিল না। কেননা স্বাধীনোত্তর ভারতের সীমান্তে ওঁত পেতে ছিলেন মহম্মদ আলী জিন্না। যিনি রাজন্যবর্গকে যে কোনও শর্তে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার জন্য সদা প্রলুব্ধ করছিলেন। এদিকে দেশের ভেতর সর্দার প্যাটেলের 'সংযুক্তি প্রচেষ্টাকে' লর্ড মাউন্টব্যাটেন অনেক সময়ই বিরোধিতা করতেন, জওহরলাল ছিলেন চিরাচরিত ভাবেই দোলাচল-চিত্ত, সদা-চিন্তিত, যদি প্যাটেলের প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। অপরদিকে বিসমার্ককে কোনও ঘরোয়া বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এমন একজন রাজা যিনি তাঁর সব প্রচেষ্টাকেই খোলাখুলি মদত দিতেন, সর্বোপরি সৈন্যদল ছিল পরোক্ষভাবে তাঁর প্রতি দায়বদ্ধ।

এদিকে সৈন্যবাহিনী অনুগত হলেও তাদের সর্বোচ্চ অধিকর্তারা তখনও ছিলেন প্রধানত ইংরেজ, যাঁরা কোনও মতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ চাইতেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে অভিযান চালানোর সময় তৎকালীন জেনারেল Roy Bucher শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্যাটেলকে বাধা দিয়ে এসেছেন। মুসলমান রাজন্যবর্গের অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে ইংরেজের উপদেষ্টা-রূপী চরবাহিনী সদাই শাসকদের ভারত- বিরোধিতায় উৎসাহিত করতেন। ১৯৪৭ সালের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স আইন পাশ করার সময় বৃটিশরা চালাকি করে রাজন্যবর্গদের ভারত পাকিস্তান উভয় থেকেই বিচ্ছিন্ন থাকার একটি ধারা ঢুকিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক রাজন্যবর্গের ধারণা হয়েছিল বৃটিশ চলে যাবার পরেও, তাদের অধীনতা শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা, স্বাধীনভাবেই কোনও দেশেই যোগ না দিয়ে রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন।

সৌভাগ্যজনক ভাবে প্যাটেল ভারতের কমনওয়েলথ সদস্য পদ নেওয়া নিশ্চিত করার পরেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঢোঁক গিলতে বাধ্য হন এবং স্বাধীন রাজ্যগুলির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। এদিকে নেহেরু কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত হওয়ায় এবং শেখ আবদুল্লা তাঁর বিশেষ বন্ধু হওয়ার কারণে কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে আলাপআলোচনার যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতেই ধরে রেখেছিলেন। যার পরিণামে কাশ্মীর উপত্যকা আজও একটি জ্বলন্ত ও অমীমাংসিত সমস্যা। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের কঠিনতম পরীক্ষা ছিল হায়দ্ররাবাদের নিজামের ক্ষেত্রে, যিনি আদতে পাকিস্তানের দালাল রাজাকারদের হাতে একপ্রকার বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন। এছাড়া তাঁর ইংরেজ উপদেষ্টা স্যার আলেকজান্ডার মঙ্কটন মাউন্টব্যাটেনের বন্ধু হলেও কট্টর পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। তাই প্যাটেলকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরই সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভূপালের নবাব হামিদুল্লা খানের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়। জিন্নার অনুগত দাস হিসেবে তিনি রাজন্যবর্গকে সবসময়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে প্ররোচিত করতে থাকেন। রাজন্যবর্গদের সভার তিনিই ছিলেন অধ্যক্ষ, সেই সুবাদে রাজন্যবর্গদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে তিনি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন। ভারত পাকিস্তানের বাইরে একটি তৃতীয় স্বাধীনসত্তাধারী পরিচয় হিসেবে এইসব দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে তিনি একটি Princestan (প্রিন্সস্থান) করার মতলবে ছিলেন। ইন্দোর, বরোদা এবং যোধপুর এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই চালিত হচ্ছিল।

ত্রাভাঙ্কোরের দেওয়ান স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার ১৯৪৭ সালের ৯ মে 'ত্রাভাঙ্কোরকে' একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ আলী জিন্নার অনুমোদন লাভ করেন। মহারাজের আর তাঁর প্রভাব এমনই ছিল যে দেওয়ান হলেও মহারাজা তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাননি। এই সময়েই আসে সর্দার প্যাটেলের মোক্ষম টেলিফোন কলটি আর তাতেই চুপসে যান দেওয়ানজী। ইত্যবসরে জুলাই মাসের শেষদিকে শাহনওয়াজ ভুট্টো (জুলফিকার ভুট্টোর বাবা) জুনাগড়ের নবাব নিযুক্ত হওয়ার পর— এটা পরিষ্কার হয়ে যায় জুনাগড় পাকিস্তানে যোগ দেবে, কেননা শাহ নওয়াজ ছিলেন জিন্নারই একান্ত অনুগত। এবং আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে এই ঘোষণাও হয়ে যায়। বলরাজকৃষণের লেখা অনুসারে জানা যায় যে সর্দার প্যাটেলকে নভেম্বর মাস অবধি অপেক্ষা করার পরই হায়দ্রাবাদে সেনা পাঠানো সম্ভব হয়েছিল তাও মাউন্টব্যাটনকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অন্ধকারে রেখে।

তবে এই বিক্ষুব্ধ সময়পর্বের কঠিনতম কাঁটাটি ছিল যোধপুর। হিন্দু শাসক, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যা কিন্তু রাজ্যের সীমানা ছিল সিন্ধু প্রদেশের সংলগ্ন। তৎকালীন রাজাটি ছিলেন স্বল্পবুদ্ধি অপরিপক্ক, সদ্য অভিষিক্ত। জিন্না তাঁকে পাকিস্তানে টানতে সই করা সাদা কাগজ পর্যন্ত ধরিয়েছিলেন যাতে মহারাজা যা ইচ্ছে শর্ত আরোপ করতে পারবেন। মাউন্টব্যাটেন পরে স্বীকার করেছিলেন রাজাকে ভারতভুক্তির ব্যাপার রাজী করাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্যাটেলের দূরদর্শী সরাসরি প্রত্যাঘাতের নীতিতেই পরিশেষে যোধপুর ভারতভুক্তিতে রাজি হয়। উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে একটা জিনিসই পরিলক্ষিত হবে যে ৫৬০টি দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি ছিল একটি বিশাল ও দুরূহ কর্মকাণ্ড। এর বহুধাবিভক্ত চরিত্র এত স্বল্প পরিসরে সঠিকভাবে ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এটা বলা অত্যন্ত জরুরি যে এই কাজকে দ্বিগুণ কঠিনতর করে তুলেছিল (১) গান্ধীজীর অহিংসার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের বাতুলতা (২) ইংরেজ সৈন্যের বলপ্রয়োগ করায় উদাসীনতা ও জওহরলাল নেহেরুর --- প্রবাদপ্রতিম 'হ্যামলেটের' মতো দোলাচল চিত্ততা। নজর করলেই দেখা যাবে যে তুলনায় বিসমার্ককে এই সব সীমাবদ্ধতার কোনওটাই মোকাবিলা করতে হয়নি। তাই তাঁর কাজ ছিল অনেক 'ক্ষুদ্র'।

(শ্রী গোরাডিয়া বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও প্রাক্তন সাংসদ, পাইওনীয়ার-এর সৌজন্যে)

অশান্ত মণিপুর : শেকড় অনেক গভীরে

বাসুদেব পাল

গত ২ নভেম্বর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছবির মতো নয়নমনোহর রাজ্য মণিপুরে দুই জাতীয় সড়ক অবরোধ উঠে গিয়েছে। সরজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সফরে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্। তবে দুদিনের সফরে কোনও সুরাহা হয়নি। কেননা, সফরের মধ্যেই নাগা জনজাতিরা পুনরায় ধর্মঘটের হুমকী দিয়েছে। শিলচর— ইম্ফল ৫৩নং জাতীয় সড়ক এবং ডিমাপুর— ইম্ফল ৩৯নং জাতীয় সড়ক ৯২ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বসাধারণ মণিপুরবাসীদের দৈনিক জীবনযাপন প্রায় নরকযন্ত্রণার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। অবরোধ চলাকালীন একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম দেড় থেকে দু'হাজার টাকায় পৌঁছেছিল, এক লিটার পেট্রলের দাম উঠেছিল দু'শ থেকে শেষ অবধি তিনশত টাকায়।

মণিপুরে লাগাতার দীর্ঘকালীন বনধ্-সড়ক অবরোধ এই প্রথম নয়। আগেও হয়েছে। উপরোক্ত দুই জাতীয় সড়ক আসলে মণিপুরের জীবনরেখা। সড়কপথে নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহের যোগাযোগের মাধ্যম। নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের।

বর্তমানে তো মণিপুরকে অশান্ত, উপদ্রবযুক্ত রাজ্য হিসেবেই দেখা হয়। এই অশান্তির শুরু পঞ্চাশের দশক থেকেই। বর্তমানের রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি তাতে আবার ইন্ধন যুগিয়েছে। ছবির মতো সুন্দর পার্বত্য রাজ্যটিতে অশান্তি প্রায়দিন লেগেই আছে। মাঝে মধ্যে ২/৪ দিন শান্তি থাকলেও আবারও অশান্তি ঘুরেফিরে আসে। তবে ১৯৭৮ সাল থেকে অশান্তি লেগেই রয়েছে। এই হিংসাদীর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। গত ৪/৫ বছরে যা চলছে তা কোনও সভ্যদেশের পক্ষে মানানসই নয়। মণিপুরের ইম্ফল উপত্যকার মানুষ এই নিয়ে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মূক দর্শকের ভূমিকাও নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। তাঁরা ভাবছেনই না যে, তাঁদের কিছু করার আছে বা করা উচিত।

সাম্প্রতিক বা সর্বশেষ অশান্তির কারণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইম্ফল সদর পার্বত্য জেলা গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়া থেকে। রাজ্য সরকার প্রায় চল্লিশ বছর আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়েই ফেঁসে গিয়েছে। তবে বাস্তবিকতা হলো, ওটাই অশান্তির একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে রাজ্যের ছাত্র- যুবসম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী বর্গ, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এমনকী মার্কামারা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোও যদি সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের উপরে উঠে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি নজর না দেয় তাহলে মণিপুরে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সকলকে সমবেতভাবে চিন্তাভাবনা করে সমাধানের পথ বের করতে হবে।

বিগত ৩৩-৩৪ বছর যাবৎ পারম্পরিক দ্বন্দ্বের রাজনীতি যেভাবে চলছে তারও কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় আছে। সরকার বনাম সন্ত্রাসবাদী দল বা গোষ্ঠী, মণিপুরী বনাম অ-মণিপুরী (বাঙালী, নেপালী, হিন্দীভাষী ও দক্ষিণ ভারতীয়) এবং নাগা-কুকি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষ। বর্তমানে দীর্ঘসময়ের মূল-সড়ক অবরোধের পিছনে রয়েছে নাগা বনাম মণিপুরী সমাজের এক আপসহীন লড়াই যদিও তা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান নয়। বা সামনা সামনি মুখোমুখিও হচ্ছে না। রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি, দরাদরির মধ্যেই সীমিত। উপর উপর যতই নিস্তরঙ্গ দেখা যাক না কেন ভিতরে ভিতরে প্রবল আন্ডারকারেন্ট কিন্তু পুরোমাত্রায় রয়েছে।

১৯৯৩ সাল থেকে যা কিছুই চলুক না কেন তা কোনওরকম বিক্ষিপ্ত কিছু নয়। ইম্ফল উপত্যকায় যাতায়াতের রাস্তা অবরোধ। কখনও নাগা জাতিগোষ্ঠী আবার কখনও কুকি-চীনা গোষ্ঠী। অবরোধ চলতেই থাকে। প্রাকৃতিক দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত মণিপুর-এ জনবসতিও দুইভাগে বিভক্ত। ইম্ফল উপত্যকায় মণিপুরীরা আর পার্বত্য ক্ষেত্রে অ-মণিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীদের সংখ্যাধিক্য। এককথায় ইম্ফল উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে জনজাতি ওরফে নাগা-জনজাতি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো।

মণিপুরে নাগা জনজাতিদের মোট আটটি গোষ্ঠী রয়েছে। যদিও নাগা জনজাতিদের গোষ্ঠীসংখ্যা আরও অনেক বেশি। ওই আটটি গোষ্ঠী হলো— তাংখুল, মাও, মারাম, মারিং,

তাড়াও, রংমাই, লিয়াংমাই এবং জেমি নাগা। এছাড়া কুকি-চীনা জনজাতি গোষ্ঠীরও বেশ কয়েকটি উপগোষ্ঠী রয়েছে। কয়েকটি প্রমুখ গোষ্ঠী হলো—কুকি, লুসাই, মার, গাঙতে, পাইতে, ভাইপে এবং থাডো প্রভৃতি। মণিপুরে রাজার শাসন থাকাকালীন মণিপুরে বিভিন্ন জনজাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকলেও ১৯৪৭-এর পর গোষ্ঠী-সংঘর্ষ বেড়ে যায়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং মারপিট আকছার ঘটে চলেছে। এর প্রমুখ কারণ সরকারের অদ্ভুত নীতি। জনজাতি সমাজের সকলে ইম্ফল ভ্যালিতে এসে বসবাস, চাকরি-বাকরি সবকিছুই করতে পারেন। কিন্তু মণিপুরীরা জনজাতি প্রধান পার্বত্য এলাকায় সাধারণত সবকিছু করতে পারেন না। চাকরি-বাকরি করতে পারলেও স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা ভাবতেও পারেন না। এর একটা কারণ পার্বত্য অঞ্চলে জনজাতিদের বিশেষাধিকার আইন রয়েছে। এসবের দৌলতে তারা সমতল এলাকাতেও নিজেদের বসতি এবং প্রভাব যুগপৎ বাড়িয়ে চলেছে। অথচ পার্বত্যক্ষেত্রে ভূমিপুত্র মণিপুরীদের কোনও বিশেষ অধিকারই নেই। এতে মণিপুরীরা নিজদেশেই পরবাসী হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত। তাঁরা ভাবছেন, এই পরিস্থিতি কেন্দ্র সরকারের কারণেই তৈরি হয়েছে। তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যেই মণিপুরে বসবাসকারী নাগা জনজাতিদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তারই ফয়দা লুটছে নাগা ও অন্য জনজাতি গোষ্ঠীরা। নিজেদের জন্মভূমিতেই ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে মণিপুরীরা।

মণিপুরের মোট ন'টি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলাই জনজাতি অধ্যুষিত। অন্য চারটি জেলা— ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুর এবং থৌবাল জেলায় মণিপুরীদের প্রভাব আছে। অন্য পাঁচটি জেলার মধ্যে চারটি জেলাতেই নাগা জনজাতিদের প্রবল প্রাধান্য রয়েছে। ওই সব জেলায় মণিপুরীরা চাকরী, ব্যবসা এমনকী স্থায়ীভাবে বসবাসও করতে পারে না। এই নাগাভীতি মণিপুরীদের মনে জেঁকে বসেছে। এখানে উল্লেখ্য, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাগা জঙ্গিগোষ্ঠী এন এস সি এন (আই-এম)-এর দুই অবিসম্বাদিত নেতা থুঙ্গলাঙ্ মুইভা এবং আইজ্যাক চি স্যু-র জন্মস্থানও মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা। রানীমা গাইডিন ল্যু'র জন্মও মণিপুরে। ভারত সরকার থেকে শুরু করে প্রায় সব গোষ্ঠীর নাগারা আইজ্যাক ও মুইভাকে নাগাদের সর্বময় কর্তা বা প্রতিনিধি হিসেবে মান্যতা দেন। আর ভারত সরকার ওই দুই বিদ্রোহী নেতাকে ভারতে সাদরে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন। ওই চুক্তি বছরের পর বছর নবীকরণ করা চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি

একীকৃত স্বাধীন বৃহত্তর নাগাল্যান্ডের দাবীতে মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের নাগারা হাত মেলান। ১৯৮০ থেকেই কখনও সহিংস আন্দোলন আবার কখনও রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী চলছে। মণিপুরীরা একে অযৌক্তিক বলছেন— যা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

করলেও অন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা জনতার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না, উল্টে তারা প্রকাশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় বুক ঠুকে ঘোরাঘুরি করলেও সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী একরকম চোখ বুজে থাকে বলা যায়। মণিপুরের বেশির ভাগ লোক মনে করেন, নাগা শান্তিবার্তার প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্যই হলো বৃহত্তর নাগাল্যান্ড বা স্বাধীন স্বতন্ত্র নাগালিম্ হাসিল করা। এই নাগালিম্-এ নাগাল্যান্ডের সঙ্গে সীমানাযুক্ত অসম, অরুণাচল ও মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত এলাকাকে সামিল করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। যা মোটেও লুকোছাপা নেই। নাগা সন্ত্রাসবাদী দল এন এস সি এন-এর দুই গোষ্ঠী এন এস সি এন-(আই-এম) এবং এন এস সি এন-(খাপলাং) উভয়েই এব্যাপারে একমত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্র সরকার খোলাখুলি না বললেও নাগাল্যান্ডে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে উগ্রপন্থীদের ওই দাবী মেনে নেওয়ার পক্ষে। কিন্তু অ-নাগা জনগণ কোনওমতেই ওই দাবী মেনে নেবেন না। এটা হলে নতুন করে ব্যাপক অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্যই কেন্দ্র চুপ-চাপ আছে। এরকম অশান্ত পরিবেশ তৈরি হওয়া আদৌ কাম্য নয়।

১৯৭২ সালে নাগাভূমি রাজ্য গঠিত হয়। তখনই নাগাল্যান্ডের নাগা নেতারা মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত বর্তমান উখরুল ও সেনাপতি জেলাকে নাগারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মণিপুরের নাগা নেতারা ওই দাবীর বিরোধিতা করেছিলেন। আসলে মণিপুরের নাগা নেতাদের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের নেতাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। মণিপুরের তাংখুল, মাও, রংমাই প্রভৃতি গোষ্ঠীর নাগারা নাগাল্যান্ডের আও, অংগামী এবং কনিয়াক গোষ্ঠীর নেতাদের অধীনে থাকতে চাননি। বিদ্রোহী নাগা নেতা এ জেড ফিজো'র নেতৃত্বাধীন নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল-এ অঙ্গামি, আও, কনিয়াক ও সেমা গোষ্ঠীর নাগাদেরই আধিপত্য ছিল। ফিজো নিজে ছিলেন অঙ্গামি গোষ্ঠীর। পরে যখন এন এস সি এন (ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগাল্যান্ড) গঠিত হয় তখন নেতৃত্বে আসেন মণিপুরের উখরুল জেলার তাংখুল গোষ্ঠীর থুঙ্লাঙ্গ মুইভা। মুইভার অক্লান্ত চেষ্টায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রতি চূড়ান্ত স্বাভিমানী মনোভাবের ২৯টি উপ-গোষ্ঠীকে একই কমান্ডের অধীনে নিয়ে আসেন। একীকৃত স্বাধীন বৃহত্তর নাগাল্যান্ডের দাবীতে মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের নাগারা হাত মেলান। ১৯৮০ থেকেই কখনও সহিংস আন্দোলন আবার কখনও রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী চলছে। মণিপুরীরা একে অযৌক্তিক বলছেন— যা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

সম্প্রতি নাগাল্যান্ডের এক প্রবীণ ও বর্তমান সাংসদের পুত্র নিজেই এই দাবীকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলছেন। তাঁর কথায় এতবছর বাদে মণিপুরের এলাকা দাবী করা হলে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। এই নেতাও আও গোষ্ঠীর। মোদ্দা কথা, দুই রাজ্যের নাগাদের মধ্যে পারস্পরিক মানসিক দূরত্ব রয়েছে। এটাই কাটাবার চেষ্টা করেছেন টি মুইভা— এই সময়ে খাপলাং গোষ্ঠীভুক্ত জঙ্গিদের বাদ দিলে সর্বসাধারণ নাগাদের কাছে তাঁর মান্যতা রয়েছে।

নাগাল্যান্ডে সব নাগা গোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে গঠিত হয়েছে— নাগা হো হো, মণিপুরে গঠিত হয়েছে 'ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল'। মণিপুরের তাবৎ নাগাগোষ্ঠী ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল-এর সদস্য। মাঝেমধ্যেই ইউ এন সি-র পক্ষ থেকে রাস্তা অবরোধ করে ইম্ফল উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

বর্তমানের অবরোধ-আন্দোলন চলছে ইম্ফল পার্বত্য জেলা গঠনকে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ সালে সংসদেই মণিপুরকে মর্যাদা দেওয়ার আগে ওখানকার জনজাতিদের স্বার্থরক্ষার্থে ছয়টি স্বশাসিত জেলা তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ওই ছয়টি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলা গঠিত হলেও ষষ্ঠ জেলা 'ইম্ফল সদর হিল' জেলা গঠন করা হয়নি। অন্য পাঁচটি জেলা হলো— সেনাপতি,

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মণিপুরে উগ্রপন্থীরাই পথের কাঁটা

শংকর পাল

মহামূল্যবান মণি-মাণিক্য উপহারে খুশী হয়ে বাংলার নবাব একদা ত্রিপুরার রাজাকে 'মাণিক্য' উপাধি দিয়েছিলেন। ঠিক সেভাবেই ভারতের রত্ন বা 'মণি' বলে পরিচিত মণিপুর রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এরকমই নানা কাহিনী প্রচলিত। পর্বত-উপত্যকা ঘেরা মণিপুর রাজ্যের পাহাড়গুলির উচ্চতা সাড়ে সাতশো থেকে সাড়ে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত। উপরে নাগাল্যান্ড, পুরো ডানদিকে মায়ানমার, নীচে মায়ানমার ও মিজোরাম এবং বাঁদিকে অসমের কাছাড় এলাকা নিয়ে গঠিত মণিপুরে

২০১১ জনগণনা অনুসারে মণিপুরের জেলানুসারে জনসংখ্যা		
	আয়তন (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা ('১১)
১. বিষ্ণুপুর	৪৯৬	২,৪০,৩৬৩
২. চান্দেল	৩,৩১৩	১,৪৪,০২৮
৩. চুড়াচাঁদপুর	৪,৫৭০	২,৭১,২৭৪
৪. ইম্ফল পূর্ব	৭০৯	৪,৫২,৬৬১
৫. ইম্ফল পশ্চিম	৫১৯	৫,১৪,৬৮৩
৬. সেনাপতি	৩,৩৯১	৩,৫৪,৯৭২
৭. তামেংলং	৪,৩৯১	১,৪০,১৪৩
৮. থৌবাল	৫১৪	৪,২০,৫১৭
৯. উখরুল	৪,৫৪৪	১,৮৩,১১৫
মণিপুর	২২,৩২৭ বর্গ কিমি	

সূত্র : উত্তর-পূর্ব ভারত : সেদিন ও আজ

রয়েছে অতীত ঐতিহ্য। মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের বিশদ বিবরণ রয়েছে।

মণিপুরের মোট আয়তন ২২,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ২১,১৫১ বর্গ কিলোমিটার পার্বত্য ক্ষেত্র এবং মাত্র ১,১৭৬ বর্গ কিলোমিটার সমতল এলাকা। স্বাভাবিকভাবে পাহাড়ের তুলনায় সমতল এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। আর এই ভৌগোলিক কারণেই মণিপুরে দুটি পৃথক জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। একটি পার্বত্য এলাকার জনজাতি-উপজাতি এবং অন্যরা সমতলের মৈতেয়ী মণিপুরী জনগোষ্ঠী।

মণিপুরে মোট নয়টি জেলা। নাম—বিষ্ণুপুর, চান্দেল, চূড়াচাঁদপুর, ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, সেনাপতি, তামেংলং থৌবাল এবং উখরুল। মোট জনসংখ্যা-২৭,২১৭৫৬ জন। মণিপুরের অধিবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। মণিপুরী বা মৈতেয়ী, নাগা এবং কুকি-চীনা জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। পণ্ডিতমহলের মতে মণিপুরের মূল বা আদি, অধিবাসী মণিপুরী না নাগারা, এনিয়ে বিতর্ক থাকলেও মণিপুরীরাই মূল অধিবাসী বলে স্বীকৃত।

মণিপুরের প্রায় প্রত্যেকটি জেলারই কোনও না কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১৯৮৩ সালে বিষ্ণুপুর জেলা তৈরি হয়, ওখানে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে যা ১৪৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্যই জেলার নাম বিষ্ণুপুর। উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় জলাশয় লোকটাক্ লেক অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে মৈরাং এই জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ্ হিন্দ বাহিনী মৈরাং-এ ১৯৪৫-এ স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা

চান্দেল, উখরুল, চূড়াচাঁদপুর এবং তামেংলং। প্রস্তাবিত সদর হিল জেলাতে মণিপুরী এবং কুকি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য আছে। এছাড়া নেপালীভাষীরাও আছেন। হয়ত বা, ওই কারণেই সদর হিল জেলা গঠন আটকে গিয়ে থাকবে। ১৯৭৪ সালে 'নায়াল কমিশন' ইম্ফল সদর পার্বত্য জেলা গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু নাগা জনগোষ্ঠী থেকে বিরোধিতা হবে— এই ভয়েই সরকার সুপারিশ কার্যকর থাকা থেকে বিরত থাকে। ১৯৮২ সালে মণিপুরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রিসাং কেইসিং ওই জেলা তৈরিতে পদক্ষেপ নিতেই মণিপুরের নাগা কাউন্সিল প্রবলভাবে বাধা দেওয়াতে তা আর হয়ে ওঠেনি। ১৯৯০-এ মুখ্যমন্ত্রী আর কে রণবীর সিং এবং ১৯৯৮-এ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডব্লিউ নিপামাচা সিংও চেষ্টা করে কিছু করে উঠতে পারেননি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ওক্রাম ইবোবি সিং ৪০ বছরের পুরাতন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে যেতে এসবের বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বর্তমানের লাগাতার অবরোধ-বনধ্ তারই ফলশ্রুতি। প্রস্তাবিত জেলাতে বেশ কিছু নাগা জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম আছে। তবে ওটা অজুহাত মাত্র। আসল উদ্দেশ্য নাগালিম্ বা গ্রেটার নাগাল্যান্ডের দাবী যা আস্তিনের তলায় প্রচ্ছন্ন। ইম্ফল উপত্যাকার মানুষই বারবার দীর্ঘকালীন অবরোধের শিকার। এনিয়ে অবশিষ্ট ভারত থেকে কোনও প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না কেন?

মণিপুরী বনাম অমণিপুরী মতভেদ তার কারণ হতে পারে। আসলে মণিপুরে বসবাসকারী বাঙালী, হিন্দীভাষী এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে মণিপুরী সমাজের আন্তরিক সদ্ভাবের অভাব রয়েছে। তবে এজন্য উগ্রপন্থী দল এবং উগ্র মনোভাবই দায়ী। ২০০১ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ৭৬ জন অ-মণিপুরী সমাজের নিরপরাধ মানুষ উগ্রপন্থীদের গুলিতে মারা গিয়েছেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ইম্ফল শহরে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে। এভাবে যাঁরা মারা যান তাঁরা হয় বাঙালী, হিন্দীভাষী অথবা ছোট ব্যবসায়ী। এঁদের কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বা থাকে না। এঁরা নিত্য নিয়মিত নানারকম অত্যাচারের শিকার। এঁদের থেকে নিয়মিতভাবে তোলা আদায় করা হয়। আবার টাকা দিয়েও রেহাই নেই। পুলিশ এঁদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রাখে। তারপর তাঁদের নির্দিষ্ট প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়। ডিটেনশন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা অমানবিক। অনেকেই চান অমণিপুরীরা মণিপুর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু নাগা, কুকি প্রভৃতি জনজাতিরা তো কোনওমতেই মণিপুরের বাইরে যাবেন না। তাঁরা দ্রুত ইম্ফল উপত্যকাতেও নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির কাজ করে যাচ্ছেন।

উত্তোলন করেছিলেন।

চান্দেল জেলার তিনটি মহকুমা— চান্দেল, তেংনৌপাল এবং চাক্‌পিকারং। জেলাটিতে জনজাতি জনসংখ্যাই বেশি। বেশিরভাগ খৃস্টান মতাবলম্বী। এই জেলাতেই রয়েছে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র 'মোরে'। অবশ্য 'পাচারকেন্দ্র' বলে মোরে'র বদনামও কম নয়। মণিপুরের সর্বাপেক্ষা বড় জেলা চূড়াচাঁদপুর। মহারাজা চূড়াচাঁদ সিংহের নামেই জেলাটির নামকরণ হয়েছে। নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী নেতাদের মূলকেন্দ্র। এককথায়, বিদ্রোহীদের আঁতুড়ঘর। মিজো নেতা লালডেঙ্গা চূড়াচাঁদপুর থেকে দীর্ঘদিন তার অভিযান পরিচালনা করতেন। বর্তমান বিদ্রোহী নেতৃদ্বয় আইজ্যাক ও মুইভারও আন্দোলনের কেন্দ্র। সর্বদাই উত্তেজনাপ্রবণ।

'ইম্ফল' রাজ্যের রাজধানী। দুটি জেলায় বিভক্ত— পূর্ব ও পশ্চিম। এই দুই জেলাতেই সর্বাধিক জনবসতি।

'সেনাপতি'। মণিপুরের বীর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ'র স্মরণেই জেলার নাম সেনাপতি। ১৮৯১-এ ইংরেজরা মণিপুর আক্রমণ করলে মহারাজা কুলচন্দ্র এবং রাজপরিবারের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ বীরবিক্রমে বাধা দেন। বৃদ্ধ সেনাধ্যক্ষ থাঙ্গল দারুণ সাহস দেখিয়ে বিরোধিতা করেন। ইংরেজরা মহারাজা কুলচন্দ্রকে নির্বাসন এবং ১৮৯১-এর ১৩ আগস্ট প্রকাশ্যে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গলকে ময়দানে ফাঁসি দেয়। মণিপুরীদের মনে এনিয়ে বিরাট ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এই জেলাতে শহর নেই বললেই চলে, সকলেই গ্রাম-পাহাড়ের মানুষ।

তামেংলং জেলা মণিপুরের পশ্চিমাংশে। কাবুই নাগাদের আদি বাসস্থান। সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। শীত প্রচণ্ড। এখানে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ গুহাপথ আছে। আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হতে পারত। মণিপুরের সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তাল পরিস্থিতির কারণে কারোর নজর নেই।

থৌবাল জেলার নিন্‌জেল গ্রামের বাজারের কাছে তিনটি বড় পাথরের স্তম্ভ। মণিপুরী ও বাংলায় লিপি খোদাই করা আছে। প্রাচীনত্ব নিয়ে কেউ বলতে পারেন না। উখরুল জেলার 'পদ্মফুল' জাতীয় 'Siroi lily' দুনিয়ার দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে কোনও পর্যটক পাওয়া যায় না।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরকে 'বিশেনপুর' বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই মণিপুর-এ রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। ১৮২৬-এ প্রথম ইন্দো-বার্মিজ যুদ্ধের পর 'ইয়ান্দাবো' সন্ধির শর্তানুযায়ী ব্রহ্মদেশের রাজা ও ইংরেজরা মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু রাজপরিবারে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদের সুযোগে ইংরেজরা রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। ১৯৪৯-এ মণিপুর ভারতভুক্ত হয়। ১৯৫৬-তে

'শিরোই লিলি'

কেন্দ্রশাসিত রাজ্য এবং ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ।

রাজর্ষি মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৬৩-৯৮)-এর সময়ে শুধুমাত্র বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে মণিপুরের কিছুটা যোগাযোগ হয়েছিল। তীর্থদর্শনকে ভিত্তি করেই রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও জগন্নাথপুরীতে ছোট-খাটো মণিপুরীভবন তৈরি হয়েছিল। সেগুলো মণিপুরী রাজবাড়ি বলে স্থানে স্থানে পরিচিত।

মণিপুরের প্রাচীন নাম 'কাংলেই পোংগাওল' (Kanglei Pongayal)। কৃষিভিত্তিক মণিপুর রাজ্যে প্রকৃত অর্থে রেল লাইন আসেনি। সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন হলো 'ডিমাপুর', যা মণিপুরে নয় নাগাল্যান্ডে। দূরত্ব ইম্ফল থেকে ২১৫ কিলোমিটার। ১৯৯০-এ উত্তর-পূর্বে শিলচর থেকে জিরিবাম পর্যন্ত রেললাইন (মিটার গেজ) সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে তারও ইম্ফল থেকে দূরত্ব ২৫৫ কিলোমিটার।

মণিপুরে প্রতিবছর তিনজনের জন্মদিন সারা রাজ্যে পালিত হয়--- প্রথম দুজন শহীদ টিকেন্দ্রজিত ও থাঙ্গল। তৃতীয়জনের নাম হিজম ইরাবত সিং, যিনি জেলে গিয়ে কমিউনিস্ট হয়ে যান। তার আগে নিখিল মণিপুর হিন্দু মহাসভার প্রধান ছিলেন। ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতির পর মণিপুরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মহম্মদ আলিমুদ্দিন। অথচ মৈতেয়ী পাঙ্গাল অর্থাৎ মণিপুরী মুসলমানদের সংখ্যা ২০০১-এর জনগণনায় ১,৬৭,২০৪ জন। মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশও নয়। পার্বত্য নাগা জনগোষ্ঠীর দুই নেতা, ইয়াংমাসো সাইজা এবং রিসাং কেইসিংও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। রিসাং কেইসিং পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সর্বাধিক সময়ের মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় ৪০টি আসন সাধারণ, ১৯টি তফসিলি উপজাতি এবং ১টি আসন তফসিলি জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উন্নয়নের সম্ভাবনাপূর্ণ মণিপুরে আজ সবথেকে বড় বাধা উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদজনিত সমস্যা। ১৯৯০-এর দশক থেকেই চূড়াচাঁদপুর, সেনাপতি ও চান্দেল জেলায় নাগা ও কুকিদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ চলছে। পাঁচটি জেলায় নাগা ও কুকিদের ২৯টি উপজাতি আছে। রয়েছে গোষ্ঠীভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী দল। নাগাদের মতো কুকিরা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৯২-এ নাগা-কুকি সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল চান্দেল জেলার গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র 'মোরে'-এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বন্দ্বে। নাগাদের যেমন এন এস সি এন (আই এম) বা এন এস সি এন (কে) প্রভৃতি উগ্রপন্থী সংগঠন রয়েছে তেমনই কুকিদেরও কুকি ন্যাশন্যাল আর্মি, কুকি ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট এবং কুকি রেভলিউশনারি আর্মি প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আছে।

কেবলমাত্র অরণ্য ও জলসম্পদকে ব্যবহার করে মণিপুরের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। রাজ্যের মোট ১৬,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জঙ্গল অধ্যুষিত। রাজ্যের মোট আয়তনের ৭৫.৮ শতাংশ। যার মধ্যে ৫,৭১০ কিলোমিটার গভীর অরণ্য। মণিপুরে এক জাতীয় হরিণ (স্থানীয় নাম 'সাঙ্গাই') পাওয়া যায় যা দুষ্প্রাপ্য। জলসম্পদও কম নয়। লোক্‌টাক্, কপিলি, খানদোং, দোয়াং কিংবা রঙ্গনজিত-এ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালালে মণিপুর নিজের রাজ্যের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য রাজ্যকে বিদ্যুৎ দিতে পারত। এককথায় বলা যায় প্রকৃতি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সাজিয়ে দিয়েছে। তার লাভ মানুষ তুলতে পারেনি। মণিপুরে আশু প্রয়োজন সুস্থির অবস্থার। যার লক্ষণ এখনও অদৃশ্য।

(তথ্য সূত্র : উত্তর-পূর্বভারত : সেদিন ও আজ —ড: মহাদেব চক্রবর্তী)

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পেসমেকার

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অধুনা বাঙালির ঘরে ঘরে যে রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে তার নাম হৃদ্‌রোগ। আর এই রোগটির সঙ্গে পেসমেকার যন্ত্রের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কচকচানিতে না ঢুকেও সোজা বাংলায় বলা চলে হৃদ্‌পিণ্ড মনুষ্যদেহে তার রক্তসঞ্চালনের কাজটি অকস্মাৎ থামিয়ে দিলে এই পেসমেকার যন্ত্রটি তখন হৃদযন্ত্রের পাম্পকার্যের প্রক্সি দেয়। মানুষের জীবনদ্বীপ অকস্মাৎ নিভে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই দিয়ে জীবনযুদ্ধের প্রদীপটিকে আরও বহু বছর প্রজ্জ্বলিত রাখতে পেসমেকার যন্ত্রের অপরিহার্যতা এতদিনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এটাও নির্মম বাস্তব যে, পেসমেকার বসানোর ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করার সামর্থ্য ক'জনেরই বা রয়েছে? তারপর ধরুন, কারুর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার স্থাপনের অল্প কিছু পরে সেই ব্যক্তির কোনও কারণে মৃত্যু হলে সচল থেকেও সেই পেসমেকারটি আক্ষরিক অর্থেই অচল হয়ে পড়ত। কারণ মৃত ব্যক্তির সচল পেসমেকারটিকে অন্য কারুর দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতিটাই অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছিল এতদিনে।

এবার সেই আবিষ্কারের পালাটা শুনে নেওয়া যাক। তার আগে জবর খবর— সেকেন্ড হ্যান্ড পেসমেকারের এই 'আবিষ্কারে'র সঙ্গে সঙ্গে পেসমেকারের দাম নিম্নমুখী হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এবং গরীবদের হৃদয়েও সেই পেসমেকার ধারণের সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এই 'সেকেন্ড হ্যান্ড পেসমেকার' আবিষ্কারের কৃতিত্ব সর্বাগ্রে পাওনা ডাঃ ভরত কাস্থারিয়ার। তবে এই কৃতিত্ব তাঁর একার নয়, হাউস্টনের টেক্সাস মেডিক্যাল স্কুলের একটি বড় দল রয়েছে কাস্থারিয়ার পেছনে। বুঝতেই পারছেন— নিখাদ ভারতীয় ডাঃ কাস্থারিয়া মার্কিনদেশে চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণারত। মার্কিন দেশ থেকেই তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন ওই সেকেন্ড হ্যান্ড

ডাঃ ভরত কাস্থারিয়া

পেসমেকারগুলিকে। মৃতব্যক্তিদের পরিবারের অক্লান্তভাবে ঘুরেছেন শোকের মুহূর্তে। মৃতদের পরিবার-পরিজনদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাদের চলে যাওয়া আপনজনদের দেহে সচল থাকা পেসমেকারটি এখনও অনেকের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম। কেউ বুঝেছেন, কেউ বোঝেননি, কেউ বা ভুল বুঝেছেন। তবে থেমে থাকেননি চিকিৎসাশাস্ত্রের এই গবেষকটি। শেষে যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বেশ কয়েকটি সেকেন্ড হ্যান্ড পেসমেকার।

তবে ডাঃ কাস্থারিয়া যে ভারতীয় স্রেফ এই কারণেই আমরা গর্বিত নই, মুম্বাইয়ের হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালকে এই চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গবেষণায় 'ডিসইনফেকশন' এবং 'স্টেরিলাইজেশন'-এর কাজে যুক্ত করে এই মহান কাজে স্বদেশবাসীকেও তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। গত সাত বছরে তাঁর এই প্রকল্পে ১২১টি ব্যবহৃত পেসমেকার আনা হয়েছে মুম্বাইয়ে। যার মধ্যে ৩৭টি পেসমেকার নতুন রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ১৬ জন রোগীর দেহে পেসমেকার পরিবর্তন করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে যে, ওই রোগীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি রোগীর পুরোপুরি হার্ট ব্লক ছিল। দীর্ঘ ৬৬১ দিন তাঁদের ওপর পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসকরা দেখেছেন এঁদের মধ্যে কারুর দেহেই সেকেন্ড হ্যান্ড পেসমেকার যন্ত্রটি বিন্দুমাত্র গোলমাল করেনি (যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহে পেসমেকার নতুন প্রতিস্থাপনের পর গোলযোগ অনিবার্য) এবং এর প্রতিস্থাপনের ফলে ইনফেকশন ইত্যাদির মতো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ারও কোনও হদিশ মেলেনি। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ডাঃ কাস্থারিয়া জানাচ্ছেন, পেসমেকারের রি-সাইকেল যে সম্ভব সেটা আজ গোটা বিশ্ব-ই মেনে নিয়েছে। তিনি আশাবাদী, আগামী আমেরিকার মতো সারাবিশ্বেও পেসমেকারের রিসাইকেল পেসমেকারের চাহিদার যথোপযুক্ত যোগান দিতে সমর্থ্য হবে। ডাক্তারী বর্জ্যের তালিকাভুক্ত হওয়ার হাত থেকে সচল পেসমেকারকে বাঁচিয়ে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অর্থ- সাশ্রয়ের যে নয়া নজির স্থাপন করলেন ডাঃ কাস্থারিয়া আর তাঁর দলবল আগামীদিনে তা যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

আউটসোর্সিং : কুফলের মাসুল গুনছি রাজনৈতিকভাবেও

কৃশানু মিত্র

বিশ্বায়নের এক মূলভূত অঙ্গ হলো 'ঠিকাদান' বা 'আউটসোর্সিং'। সাধারণ বাংলায় এর মানে হলো, আমার কাজ অর্থ এবং সুবিধার বিনিময়ে করবে আরেকজন আর কাজটা হবে আমার নামে। এই ঠিকাদানকে গাছের পাকা আম কিংবা পাশ্চাত্যের হট্ কেকের মতো লুফে নিয়েছে মানবজাতি; ধর্ম, বর্ণ, জাতি, দেশ, ভাষা নির্বিশেষে মানুষ ঠিকাদানকে আপন করে নিয়েছে অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের মতোই। বিশ্বের কোনও দেশ, কোনও জাতি, কোনও বর্ণের মানুষ বাকি নেই যারা এই ঠিকাদানকে দু'হাত তুলে লুফে নেয়নি। তবে আমার এই তথ্যটি শুধুমাত্র তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার জন্যই প্রযোজ্য। আফ্রিকার জঙ্গলের কিংবা আন্দামানের সেন্টিনাল উপজাতির মানুষজনদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।

এব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক। বড় বড় শিল্পমহল নিজেদের ফ্যাক্টরীর কাজ কমিয়ে বা পুরোপুরি বন্ধ করে আউটসোর্সিং বা ঠিকাদানের মাধ্যমে বাইরে থেকে নিজের নামে উৎপাদন করে নিজেদের মুনাফা বহুগুণ বাড়িয়ে নিল। কর্মীদেরও ধীরে ধীরে আউটসোর্স করা চালু হলো। এখন তো ব্যাঙ্ক, তথ্যপ্রযুক্তি এমনকি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলেও কর্মী নিয়োগ আর সম্পর্কিত দপ্তর বা বিভাগ সোজাসুজি করে না। এই সবই ঠিকাদান বা আউটসোর্স করা হয়। স্কুল, কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শুরুতে অশিক্ষক কর্মীদের দিয়ে শুরু করলেও এখন বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আউটসোর্স বা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে। আজকাল আপনি কোনও অফিসে যাবেন তো সিকিউরিটি, চা-জল দেবার ছেলে, রিসেপশনের ম্যাডাম, এমনকি অফিসে অন্য যাদের কাজ করতে দেখেন তাদের বেশিরভাগই এরকম আউটসোর্স করা কর্মী। সরকারি ব্যাঙ্কে এখনও সেরকমভাবে চালু না হলেও বেসরকারি ব্যাঙ্কে এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আর দু'একজন উচ্চপদস্থ কর্মী বাদ দিয়ে বাকি সবাই প্রায় এরকম আউটসোর্স করা কর্মী।

আউটসোর্সের লাভ— কর্মী নিয়োগের ঝামেলা বা পি. এফ., ইনক্রিমেন্ট, ইনসেনটিভের গল্প নেই। কাজের গুণগত মান বুঝিয়ে কাজ দাও আর নেওয়ার সময় তা বুঝে নাও, মাঝের কোনও দায়িত্ব রইল না। ঝড়, জল, বৃষ্টি, শরীর খারাপ, বন্‌ধ যাই হোক আপনার কোনও মাথাব্যথা নেই, সোজা কথায় যাকে বলে সস্তায় পুষ্টিকর।

এরপর আজকাল যাদের ব্যাপারে দিন, দুপুর, রাত, ভোর সবসময় প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে শুনতে হয় সেইসব এন. জি. ও. বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আউটসোর্সিং। এখন যতবড় এন. জি. ও. তত বেশি ঠিকাদান। একদম কর্পোরেট স্টাইল আর কালচারে এঁরাও বিভিন্ন ছোট এন. জি. ও., পাড়াতুতো ক্লাব এবং কিছু বেকার ও উদ্যোগী ছেলেমেয়েদের আউটসোর্স করে দিব্যি নিজেদের কাজ করে চলেছে। এরপর পালা সরকারের। যদিও আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক দেশ এই আউটসোর্সিংকে তাদের সরকার চালাবার প্রক্রিয়াতে সামিল করেছে কিন্তু ভারতবর্ষে এর সরকারী আবির্ভাব ঘটল ইউ পি এ-দুই সরকারের আমলে। যদিও শুরুতে সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে মনমোহন সিং এই ঠিকাদানকে টেনে আনেন কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেই এর জালে জড়িয়ে যান। অনেকটা উপর চালাকি করতে গিয়ে বোকা বনে যাবার মতো। সাংবিধানিক কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকাঠামোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বাইরে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জন্য, এক সমান্তরাল শক্তিকেন্দ্র এবং পেছন দরজা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদের সঙ্গে সরকারি ক্ষমতার মধ্যে এক সমান্তরাল ক্ষমতা ও শক্তিকেন্দ্র তৈরি করতে গিয়ে একদম ছুঁচো গেলার অবস্থা হয়েছে মনমোহন সরকারের। এই ইউ পি এ-২ সরকারে সোনিয়া গান্ধী যে প্রধানমন্ত্রীর থেকেও শক্তিশালী তাতে কারও মনে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এই শক্তিকে সরকারি শীলমোহর লাগাতে গিয়ে শুরু হলো যত সমস্যা। প্রথমে ক্ষুদ্রভাবে এটা প্রদর্শিত হলো। যেমন— প্রধানমন্ত্রীর সাথে সোনিয়া গান্ধীকে এক মাপে দেখানো। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, রাস্তার হোর্ডিংয়ে, যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সমান বা কোনও কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রীর থেকেও বড়ো চেয়ারে সোনিয়া গান্ধীকে বসানো। এরপর National Advisory Council (N.A.C.) বা রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদের মারফত সোনিয়া গান্ধীকে সুপার প্রাইম-মিনিস্টার করে দেওয়া। যে কাজটা সরকারের এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার করা উচিত কিংবা ক্ষমতাশীল জোটের করা উচিত সেই কাজটা আউটসোর্স করে দেওয়া হলো এই পরামর্শদাতা পরিষদকে। এই পরিষদ (N.A.C.) কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ করতে শুরু করল, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আইন বানানোর প্রস্তাব আনতে শুরু করল।

সোনিয়া নেতৃত্বাধীন এই পরিষদ হয়ে উঠল দেশের অসাংবিধানিক শীর্ষ মন্ত্রীপরিষদ আর সোনিয়া গান্ধী দেশের অসাংবিধানিক শীর্ষমন্ত্রী। এই পরিষদে যারা আছেন তাদের একটাই পরিচয় তারা বেসরকারী, তথাকথিত অরাজনৈতিক সমাজকর্মী এবং ঘোর হিন্দুত্ব বিরোধী, এঁদের প্রতিপত্তি এবং ঠাঁটবাট দেখে এবার অন্যান্য বেসরকারী, অরাজনৈতিক সমাজকর্মীরাও এই দলে যোগ দেবার প্রেরণা পেলেন।

এর থেকে শুরু হলো বাবা রামদেবের আন্দোলন, আন্না হাজারের আন্দোলন। আমি এঁদের আন্দোলন বা তার পেছনের ভাবনাকে কোনওভাবে ছোট করছি না। কিন্তু সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার যে পদ্ধতি আর আন্দোলনের রূপ তার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হলো দুর্বল মনমোহন সরকারের আউটসোর্সিংয়ের অঙ্গ হয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করা। সে কাজ সামাজিক হতে পারে, লোকহিতের হতে পারে আবার শুধুমাত্র কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের হিতেরও হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার এইসব বেসরকারী, তথাকথিত অরাজনৈতিক সমাজকর্মী নিজের নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার আর ব্যবসায়ের ডালি নিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। এটাই হলো মনমোহন সরকারের ছুঁচো গেলার অবস্থা। এদের এক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং স্রেফ নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য বিনায়ক সেনের মতো ঘোষিত মাওবাদী আর দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত একজনকে প্ল্যানিং কমিশনের পরামর্শদাতা প্যানেলেও স্থান দিয়েছে এই মনমোহন-সোনিয়া সরকার। আবার প্রয়োজন বুঝে গেরুয়া বসনধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর সত্যাগ্রহ আটকানোর জন্য মাঝরাতে ঘুমন্ত মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধ, বাচ্চাদের বেধড়ক পিটিয়েছেও এই সরকার। একদিকে আন্না হাজারের একটি লোকপাল বিলের দাবী মেনে অপরদিকে আবার বেকায়দায় পড়ে তার এবং তার দলবলের পেছনে আয়কর দপ্তর আর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-কে লেলিয়ে দিয়েছিল এই সরকারই।

‘বিচ্ছিন্নতাবাদে’র সমস্যায় জেরবার উত্তরবঙ্গ

বিশেষ প্রতিবেদক॥ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় এখন পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম জোরদার হয়ে উঠেছে। কে এল ও-র মতো সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক কামতাপুর রাষ্ট্রের দাবী জানালেও কামতাপুর আন্দোলনে নরমপন্থীরা কামতাপুর পিপলস পার্টির ব্যানারে ভারতীয় সংবিধানে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবী তুলেছেন। যদিও কেপিপি নেতা অতুল রায় নিজেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনে করেন না। তিনি মনে করেন যে বাঙালীদের সঙ্গে কোচ ও রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতির কোনও মিল নেই। তারা পৃথক জাতি, বাঙালি নন। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে লাখ লাখ ছিন্নমূল মানুষ উত্তরবঙ্গে এসে নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথক রাজ্য ছাড়া তাদের কোনও উপায় নেই। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে পূর্ব বাংলা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের বহিষ্কারের দাবী তুলেছে কামতাপুর আন্দোলনকারীরা।

বিমল গুরুং দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার সঙ্গে তরাই-ডুয়ার্সের একাধিক মৌজা যে জি টি এ, পরবর্তী সময়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবী তুলেছেন তা কেপিপি সমর্থন করে না। তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমাকে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদে যুক্ত করার দাবীও মানেন না। পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবীতে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়ি মহকুমার একাংশ সহ অসমের গোয়ালপাড়া ও কোকড়াঝাড় জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে পৃথক বোড়োল্যান্ড গঠনের দাবীকে কামতাপুরীরা সমর্থন দিচ্ছে। এদিকে কোচবিহার জেলায় গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবী তুলেছে। ১৯৪৯ সালে করদ রাজ্য কোচবিহার ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে তা পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে কোচবিহারে পৃথক রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী উঠতে শুরু করেছে। পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে, যে উত্তরবঙ্গের তফসিলি ও আদিবাসীদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীন মনোভাব থেকেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া দেশভাগের পর উত্তরবঙ্গে কয়েক লাখ উদ্বাস্তু এসেছেন। তার ফলে স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক, সামাজিক ঐতিহ্য বিপন্ন হওয়ার ভয় ঢুকেছে। এই ভীতিকে কাজে লাগিয়ে কায়েমি স্বার্থান্বেষী শক্তি ত্রিপুরার ধাঁচে আদিবাসী বাঙালী সংঘাত বাধানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যেও বর্ণ ও ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা চলেছে।

অসমে বোড়ো উগ্রপন্থী ও স্বাধীন অসম রাষ্ট্র গঠনের দাবীদার আলফার পরেশ বড়ুয়া গোষ্ঠীর কাজকর্মে কামতাপুরীরা উৎসাহিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে যে পাক গুপ্তচর চক্র আই এস আই, বিদেশী অর্থপুষ্ট এন জি ও এবং চার্চের একাংশ যেভাবে ত্রিপুরা, অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত জোগাচ্ছে অনেকটা সেই ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসব শক্তি কাজ করে চলেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গেড়েছে। শুধু কামতাপুরই নয়, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ও ডুয়ার্সের কিছু অংশ নিয়ে নতুন করে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের আওয়াজ তোলা হচ্ছে। মেঘালয় ও অসম থেকে চলে আসা নেপালীদের একাংশ এখন দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও সিকিমে নানা কারণে আস্তানা গেড়েছে। এদের মধ্যে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের প্রচার চালানো হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে নানা অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ভিত তৈরী হচ্ছে। কামতাপুরী উগ্রপন্থীরা অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছে। এদের আন্দোলনে অসমের আলফা ও উগ্র বামপন্থী মাওবাদীরা তলে তলে মদত দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদীরা যে জোট বাঁধতে চাইছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী বলে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস মনে করছে। বিদেশী শক্তির মদতে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটলেও রাজ্য প্রশাসন কড়া মনোভাব দেখায়নি। ফলে অবস্থা আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি ও উন্নয়নের বার্তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সফরের পর জঙ্গলমহলে গেছেন, সেখানে মাওবাদী সমস্যার মূল আদিবাসী-জনজাতিদের আর্থিক, সামাজিক উন্নয়নকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন। এদিকে উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রবামপন্থা ক্রমেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। পাহাড় ও সমতলের সংঘাত মেটাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তি ও উন্নয়নের বার্তা নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পর পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি হলেও শেষ পর্যন্ত তা কোন দিকে গড়ায় সেদিকে তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর এখন আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্র, জঙ্গি, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র আই এস আই শিলিগুড়ি করিডর করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল, অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন জঙ্গি, বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে। তাছাড়া নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে, পাকিস্তান হাইকমিশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে উগ্রপন্থী তৎপরতা বাড়ানোর জন্যে আর্থিক অস্ত্রের সহায়তা চালাচ্ছে আই এস আই। নানা কারণে শিলিগুড়ি শহর এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চলে এসেছে। আন্তর্জাতিক চোরাই চালান চক্র এখানে ঘাঁটি গেড়ে মাদক অস্ত্রের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেও শিলিগুড়ি এখন সংবেদনশীল শহরে পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ জুড়ে কামতাপুর ও পৃথক গোর্খাল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী এখানে ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। রাজ্য সরকার-গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জি টি এ) চুক্তি স্বাক্ষরের পর এনিয়ে আশঙ্কা আরও বাড়ছে। এদিকে সশস্ত্র গোর্খা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নেপাল থেকে পালিয়ে আসা মাওবাদীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ি শহর।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সক্রিয় তাদের মধ্যে উলফা, এন ডি এফ বি এবং উত্তরবঙ্গের কে এল ও-র ভাল রকম নেটওয়ার্ক পরিচালিত হচ্ছে শিলিগুড়ি ও তৎসংলগ্ন উত্তরবঙ্গের আরও কিছু স্থান থেকে। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে পুলিশ প্রশাসনকে ও গোয়েন্দা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার কথা বলছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কে এল ও, উলফা এবং বোড়ো জঙ্গিদের আই এস আই সাহায্য করছে জানিয়ে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে উত্তর-পূর্বের জঙ্গিদের ভূটান ও বাংলাদেশে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে বলে প্রতিবেদন পাঠিয়ে বিদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘাঁটিগুলো তুলে দেবার জন্যে বাংলাদেশ ও ভূটান সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক দাবী পেশ করার অনুরোধ করে এসেছিল। ভূটান কড়া ব্যবস্থা নেয়। মূলত ভারত সরকারের চাপে ভূটানের কিছু সক্রিয়তা দেখা গেলেও বেগম খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশ সরকার বরাবর বলে এসেছিলেন যে উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী বা জঙ্গিরা বাংলাদেশে নেই।

কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় খুশি কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ও শেখ হাসিনার বন্ধু পশ্চিমবঙ্গের জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি যাতে জঙ্গিদের করিডোর হয়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ)

গোহত্যা বন্ধে আদালতের রায় ও কেন্দ্রীয় আইন

ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় প্রদত্ত রায় তথা এই দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে সম্পূর্ণ রূপে গোহত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু কোনও কেন্দ্রীয় আইন না থাকায় নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে গোহত্যা হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। যেমন--- (১) ভারতবর্ষের কৃষি, সুস্বাস্থ্য, ঔষধবিদ্যা, অর্থনীতি, উন্নতি সমূহের ধারক রূপে গোবংশের ভূমিকা ও আশীর্বাদ তথা পারস্পরিক শাস্ত্র অনুযায়ী অবধ্য (অঘ্না) গোমাতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার উদার পর্যালোচনার মধ্যে এই দেশের আইনে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। বেশীরভাগ রাজ্যেই বকরী ঈদেও গোহত্যা নিষেধের প্রবিধান যুক্ত আইন প্রবর্তিত আছে।

(২) কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, সমস্ত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, অত্যন্ত ভয়াবহ ও নির্দয়ভাবে, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক এক কু-চক্রান্তে এবং বিশেষতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তোষণের জন্য অমানবিক এই গোহত্যা বেড়েই চলেছে। যদিও হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, আর্যসমাজী এবং সমস্ত বৈদিক ও আর্য ভাবধারার সনাতনী সমাজ এই গোহত্যার রোধ চাইছেন, তবুও আইনের বিপরীতে গিয়ে এই গোহত্যা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গত বৎসর (২০১০) এরাজ্যে চালু পশ্চিমবঙ্গ পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫০ (W.B. Animal Slaughter Control Act 1950)-এর ১২নং ধারা অনুযায়ী, অত্যন্ত চাতুরীর সঙ্গে মহামান্য ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বকরী ঈদে গোহত্যার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(৪) সকলেই অবগত আছেন যে, কেদারনাথ সাহানী ও অন্য ২৬ জনের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্য ২০ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায়, মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় বকরী ঈদেও গো হত্যা আবশ্যিক নয় বলে জানিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য ১৯৮২ (২) কলকাতা, এইচ এম, তাং ২০-৮- ১৯৮২)।

(৫) উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থনায় গেলে (দ্রষ্টব্য সি এ ৬৭৯০/১৯৮৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্য বনাম আশুতোষ লাহিড়ী ও অন্যান্য), মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা উচ্চ আদালতের আদেশ বহাল রেখে, রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে (বকরী ঈদ সহ) গোহত্যা নিষেধে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়।

(৬) এতদ্‌সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ তথা অন্যান্য রাজ্যে শুধুমাত্র বকরী ঈদে প্রায় ৩০ লাখ গোহত্যা (পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ লাখ) সংগঠিত হয়ে চলেছে। দুঃখজনক ভাবে স্থানীয় পুর-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পুলিশ- প্রশাসনের একাংশের যোগসাজসে এই বেআইনী ও সক্ষম-কমবয়সী-কৃষি উপযোগী দুধেল গোবংশের নির্দয় হত্যা চলছে।

(৭) উক্ত দুর্ভাগ্যজনক স্থিতিতে পীড়িত ও হিন্দু অভিমানে আঘাতপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা যথা, অখিল ভারত কৃষি গো সেবা সঙ্ঘ, আর্য প্রতিনিধি সভা, শ্রী কে কে সিংহানিয়া, অভিজিৎ দাস ও ইনামুল হক প্রভৃতি সুবিচার প্রার্থনায় ও গোহত্যা সম্পূর্ণ রূপে নিরোধের জন্য মহামান্য আদালতগুলির নিকট দ্বারস্থ হচ্ছেন।

(৮) এটিও উল্লেখণীয় যে, বিশিষ্ট ইসলামিক প্রতিষ্ঠান যেমন 'দারুল- উলুম-দেওবন্দ' বকরী ঈদে গোহত্যা বন্ধের জন্য ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন (দ্র. দৈনিক জাগরণ, ১৩-০৬-২০০৬)।

(৯) যখন ভারতে অপুষ্টির কারণে প্রতিদিন ৫০০০ শিশুমৃত্যু ঘটে (দ্র. বিশ্ব শিশু অবস্থা প্রতিবেদন-২০০৮, ইউনিসেফ) ও তারা এক ফোঁটাও দুধ পায় না, তখন এই ধরনের গোহত্যা, ভারতের অপুষ্টি-পীড়িত গরীব মানুষজনের নিকট এক অভিশাপ স্বরূপ।

(১০) এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, গো বংশ ভারতের কৃষি, স্বাস্থ্য, পুনঃনবীকৃত শক্তি ও চিরাচরিত শক্তি এবং ভারতের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তি। এই সনাতনী দেশে 'গো মাতা' ও 'গো পালক'দের জন্য শ্রদ্ধা সর্বোচ্চ। কিন্তু যেভাবে এই শান্ত ও আদরণীয় প্রজাতির হত্যা করে হিন্দু অভিমানে আঘাত দেওয়া হচ্ছে, তা ভারতীয় পেনাল কোডের ধারা ১৫৩ ও ২৯৫ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(১১) উপরন্তু, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ৭ জন ন্যায়াধীশ যুক্ত পীঠ, সি. এ. ৪৯৩৭-৪৯৪০/১৯৯৮— গুজরাট সরকার ও অন্য বনাম মির্জাপুর মোতি কুরেশি কাসাব ও অন্য মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিয়েছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ততা, সার ও শক্তিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ১৬ বৎসরের উপরের ষাঁড়গুলিকেও হত্যা করা যাবে না। (দ্রষ্টব্য : ২০০৫/ এস সি সি এল. কম-৭৩৫)।

(১২) দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে কোনওরকম বৈষম্য ছাড়াই গোহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তথাপি এই পবিত্র দেশে পবিত্র গো-বংশ হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন এখনও বাকী রয়েছে। যার ফলে ফাঁকফোকর দিয়ে নানা বিচ্যুতি সহায়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ হিন্দু অভিমান ও প্রচলিত আইন এবং বিভিন্ন ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্রমাগত গোহত্যা করে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে—

(ক) সরকারি ব্যবস্থা ও বিভিন্ন গোহত্যা নিরোধ ও গো-সেবা সংগঠনগুলির সহায়ে একটি কার্যকারিণী বাহিনী (Task Force) গঠন করুন যাতে গোহত্যা বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান গোহত্যা বন্ধ করা যায়। বকরী ঈদের সময় ও অন্য সময়েও হত্যার জন্য আন্তঃরাজ্য গরু চালান-বাণিজ্য আবশ্যিকভাবে বন্ধ করা হোক।

(খ) যাঁরা রাজ্যে রাজ্যে প্রযুক্ত প্রাণী হত্যা নিরোধ আইন লঙ্ঘন করবেন তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইন (NSA) প্রয়োগ করা হোক।

(গ) একটি উচ্চ ক্ষমতা যুক্ত পরিকল্পনা নিয়োজন বাহিনী রচিত হোক, যারা গো হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত উলঙ্ঘন ও বিরোধিতা দেখভাল এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন ও উপদ্রুত এলাকাগুলিতে ভূমি থেকে প্রয়োজনে আকাশযান (helicopter) চলচ্চিত্র (Videography) ধরে রাখবেন।

(ঘ) যে সমস্ত ব্লক ও থানায় অবৈধ গো হত্যা সংগঠিত হবে, সেই সমস্ত ব্লক ও থানা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

(ঙ) বিভিন্ন গো-সেবা সংগঠন ও সরকারি উদ্যোগে যে গোরু উদ্ধার করা হবে তাদের পুনর্বাসন ও সদুপযোগের জন্য জেলা স্তরে গো-পুনর্বাসন (গোশালা) তৈরি করে, ভারতীয় কৃষি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শক্তি, পারস্পরিক ঔষধ প্রস্তুত ইত্যাদির মাধ্যমে ধারাবাহিক উন্নয়নের অনুকূলে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হোক।

—উপানন্দ ব্রহ্মচারী, কলকাতা।

কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করা আর মিঞা সাহেবদের সন্তুষ্ট করা একই ব্যাপার

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কুকুরের বাঁকা লেজ যেমন সোজা করা যায় না, তেমনই মিঞা সাহেবদেরও কখনও সন্তুষ্ট করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্বভার গ্রহণ করা ইস্তক সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা করে চলেছেন। মিঞা সাহেবরা কিন্তু সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গে আদৌ দশ হাজার খারিজি বা বেসরকারি মাদ্রাসা নেই, তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী দশ হাজার বেসরকারি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এতে কি হবে? ব্যাঙের ছাতার মতো আনাচে- কানাচে বেসরকারি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠবে, আর সে সব মাদ্রাসায় স্থানীয় অল্প-শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মোল্লারা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেবে। ওই সমস্ত মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস এবং কোরান-হাদিসের কিছু আয়াত ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষাদান হয় না। ফলে ফেকাহ্ ও হাদিস পড়া কোনও চাকরীপ্রার্থী সরকারি বা বেসরকারি কোনও অফিসে আদৌ কোনও চাকরী পাবে কি? অবশ্যই না। তাহলেও ওই দশ হাজার মাদ্রাসাকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে কিছু ইমাম, মৌলানা, মৌলবীকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া মুসলিম সমাজের কোনও উন্নতিই হবে না। গত ৩০ জুলাই ২০১১ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একতরফাভাবে ঘোষণা করলেন প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘুদের জন্য 'হাউজিং' তৈরি করা হবে। প্রতি বছর ৫০ হাজার আবাসন তৈরি করা হবে মুসলমানদের জন্য।

উল্লেখিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পরিণাম কি হতে পারে? অভিজ্ঞতা বলছে—আবাসন প্রকল্পগুলির জন্য প্রতি জেলায় একাধিক মিনি পাকিস্তান গড়ে উঠবে। সেই সমস্ত এলাকায় প্রতিবছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হবে। সংরক্ষণের সুযোগে তৈরি হবে কিছু নিম্নমানের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপক, অধ্যাপক প্রভৃতি। সারারাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হবে।

সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে প্রস্তাবিত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ার জন্য কলকাতা-সংলগ্ন নিউটাউনে ২০ একর জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নয়, নিউটাউনের ঘুনি যাত্রাগাছিতে ১০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠবে হজ হাউস। কলকাতায় পার্ক সার্কাসে একটি হজ হাউস আছে। কিন্তু সেটি যথেষ্ট না হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভি আই পি রোডের ওপর কৈখালিতে একটি 'হজ টাওয়ার' তৈরি হয়েছিল। তাতেও নাকি হজ যাত্রীদের তীব্র অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই নিউটাউনে আরও একটি হজ হাউস তৈরি করা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লক্ষাধিক টাকা খরচ করে যাঁরা হাজী হতে যাচ্ছেন তাঁরা প্রয়োজনে নিজ নিজ ব্যয়ে হোটেলে থাকতে পারবেন না কেন? তাঁদের জন্য সরকারি ব্যয়ে হজ হাউস কেন?

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার তাগিদে নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে টিপু সুলতানের নামে নামকরণ, বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম বাহাদুর শাহ্ জাফরের নামে নামকরণ, কলকাতার বড়বাজারে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে একটি মসজিদের সম্প্রসারণের কাজে কিছু বহিরাগত মুসলমানকে মদত দান, সিঙ্গুরে ধর্ণামঞ্চে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম কায়দায় নমাজ পড়া এবং সঙ্গীসাথীদের মাথায় টুপি পরিয়ে ইফ্তার পার্টিতে যোগদান পশ্চিমবঙ্গবাসী বিস্মৃত হননি নিশ্চয়ই। আরও লজ্জার কথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না লেখিকা তস্লিমা নাসরিনকে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রায় একরকম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বহিষ্কার করেছিল তখন এই কাজকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন 'তসলিমা থাকলে যদি অশান্তি হয় তাহলে তাঁর চলে যাওয়াই ভাল।' কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে, কেন করছে জানা সত্ত্বেও কিছু ইমাম, মৌলানা, মৌলবীর প্রীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর এই প্রয়াস।

কিন্তু এত সত্ত্বেও শেষরক্ষা হচ্ছে না। গত ৩১ আগস্ট কলকাতা ময়দানে, রেড রোডে ঈদ উপলক্ষে জমায়েত ৪ লক্ষ মুসলমানদের উদ্দেশে নামাজ পরিচালক ইমাম 'কারী ফজলুর রহমান' বলেন, নতুন সরকার যে তৎপরতার সঙ্গে সিঙ্গুর, গোর্খাল্যান্ড বা জঙ্গলমহল সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নিচ্ছে, মুসলমানদের সমস্যার সমাধানে ততটা তৎপরতা দেখাচ্ছে না। পূর্বতন সরকারের যা ঘটেছিল তা থেকে বর্তমান সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইমামসাহেব ফজলুর রহমান পরিষ্কারভাবে বলেন, সংখ্যালঘু সমাজের মতাদর্শের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, তারা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন যাতে তিনি মুসলমানদের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করতে পারেন।

মিঞা সাহেবদের বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে তারাই। একথা অনস্বীকার্য বামফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গের জোটবদ্ধ মুসলমান ভোট বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যাওয়া। তবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পতনের সূচনা হয়েছিল সেদিন, যেদিন আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে বামফ্রন্ট কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের সংস্রব ত্যাগ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসী বহুদিন ধরেই রাজ্য-সরকারের পরিবর্তন চাইছিল। এবার সেটা সম্ভব হয়েছে।

তবে মিঞা সাহেবদের কোনওভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর গোঁসা করা উচিত নয়। তিনি তো মুসলমানদের জন্য জান কবুল করেছেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে দেগঙ্গার চট্টলপল্লীর বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে মুসলমানরা সরকারি জমিতে বে-আইনিভাবে নির্মিত কবরস্থানের সম্প্রসারণ ঘটাতে না পেরে ইসলামিক তাণ্ডব সৃষ্টি করে হিন্দুদের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল, সরকারের ব্যবস্থাপনায় সেখানে পাঁচিল দিয়ে কবরস্থানে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হলো। গত আগস্টে ইদল ফেতরের আগে কলকাতার সব বড় বড় মসজিদগুলিও কলকাতা কর্পোরেশন থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হলো, উর্দুকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। আরও অনেক কিছু হচ্ছে, হবে। কিন্তু যত কিছুই করা হোক না কেন, কুকুরের বাঁকা লেজ যেমন সোজা করা যায় না, তেমনই মিঞা সাহেবদেরও কখনওই সন্তুষ্ট করা যায় না।

কার্তিক উৎসব

নবকুমার ভট্টাচার্য

পরম্পরা

পার্বতীনন্দন কার্তিক মন্দিরে নগরে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র পুজো পেয়ে আসছেন। রাজন্যবর্গ থেকে সাধারণ মানুষ সুজন দুর্জন সকলেই পুজো করেন এই বিচিত্র চরিত্রের দেবতাকে। বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' 'মেঘদূত' কাব্যে, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে কার্তিকের কথা রয়েছে। কার্তিকের বহু নাম। নানা নামে তাঁর পরিচয়। কুমার, স্কন্দ, বিশাখ, মহাসেন, গুহ, সুব্রহ্মণ্য, কামজিৎ, শুচি প্রমুখ তাঁর নাম। স্কন্দপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণে তাঁকে যোগীশ্বর, ব্রহ্মচারিন্ সর্বশক্তিধর প্রভুও বলা হয়েছে। মহাভারতে, পুরাণে ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে কার্তিকের জন্মের বিচিত্র সব কাহিনী রয়েছে। মহাভারতের শল্য এবং অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে কার্তিক হলেন— শিব অগ্নি গঙ্গা উমা এবং কৃত্তিকার পুত্র। স্কন্দ ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন বলেই তিনি কার্তিক। গীতায় কৃষ্ণ যোদ্ধাদের বলেছেন তিনি স্কন্দ। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন, নগরতোরণে, ব্রহ্মা ইন্দ্র যম এবং সেনাপতি কার্তিকের অধিষ্ঠান থাকবে। মহাকাব্যে কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি এবং তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান মহিষ ও তারকাসুর বধ। স্কন্দের প্রধান আয়ুধ হলো শক্তি— যা বিশ্বকর্মা সৌরশক্তি থেকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে কার্তিক কেবল যোদ্ধাই নন জ্ঞান ও বিদ্যাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ ও কূর্মপুরাণে তাঁর ওইসব বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে। তামিল পুরাণ মতে কার্তিক শিবকে 'বিজ্ঞানামৃতবারিধি' মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে কার্তিক যুদ্ধের দেবতা অপেক্ষা জ্ঞানের দেবতা হিসেবেই বেশি পরিচিত।

কুমার ও যোগীরূপে কার্তিককে নারীসঙ্গ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কার্তিকের মন্দিরে নারীদের প্রবেশ নিষেধ। কবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'তে কার্তিকের থানে নারীদের গমন নিষিদ্ধ ছিল। আসলে কার্তিকের মাতা গৌরীর সঙ্গে একবার প্রচণ্ড বিবাদের ফলে কার্তিক নারীদের তাঁর মন্দির দর্শন নিষিদ্ধ করেছেন। তবে প্রাচীনকাল থেকেই কিন্তু কার্তিক ছিলেন বন্ধ্যা নারীদের সন্তান। বিশেষ করে পুত্রসন্তান লাভে বরদানের দেবতা। কার্তিক আবার চোর-ডাকাতদেরও দেবতা। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-এ বর্ণনা রয়েছে যে 'কনবহন্তী নামে এক ঋষি চোর ডাকাতদের গুরু ছিল, যাকে তারা কার্তিকের অবতার রূপে পুজো করত। কাশ্মীরী পুরাণ অনুসারে আমাদের দেশে চুরি ডাকাতিতে সিদ্ধিলাভের জন্য কার্তিক আবার চৌর্যশাস্ত্রও প্রবর্তন করেছিলেন। ষষ্ঠী এবং কৌমারী কার্তিকের শক্তি। কিন্তু তার বিবাহিত বধূ বলতে সেই নারী যার পরিচিতি উত্তর ভারতে দেবসেনা এবং দক্ষিণ ভারতে ষষ্ঠী। দৈত্যদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভাবছিলো এমন একজন বীরের এবার প্রয়োজন যে দানবদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারবে। সে সময় ইন্দ্র মানস পর্বতে বিচরণ করছিলেন। হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন কেশী নামে এক দানব একটি মেয়েকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে উদ্ধার করে ইন্দ্র

তার পরিচয় জানলো সুন্দরী যুবতীটি ব্রহ্মার কন্যা। দেবরাজ তার নাম দিলো দেবসেনা। দেবসেনা তাকে অনুরোধ করলো প্রকৃত এক বীরের সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করতে। ইন্দ্র অনুমতি চাইলো ব্রহ্মার কাছে। পাত্র নির্বাচিত হলো কার্তিক। কার্তিকের বিবাহ দৃশ্যের পাথুরেপ্রমাণ রয়েছে। মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের বিবাহের কাহিনীটি রয়েছে।

বঙ্গদেশে কার্তিকমাসের শেষ দিনটিতে হয় কার্তিক পুজো। মহিলারা সন্তান লাভের কামনায় এই পুজো করে থাকেন। বাংলার দুই তিনটি স্থানে সার্বজনীন কার্তিক পুজো খ্যাতি লাভ করেছে। এরমধ্যে প্রথমেই কাটোয়ার নাম উল্লেখ করতে হয়। বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় সার্বজনীন কার্তিক পুজো হয় শতাধিক। এছাড়া বাড়িতে বাড়িতে কার্তিক পুজোর চল তো আছেই। তবে ঘরোয়া কার্তিক পুজো 'কার্তিক ফেলা' ঘটিত নয়। বাড়িতে লক্ষ্মী সরস্বতী পুজোর মতো কার্তিকও পূজিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কাটোয়ার তাঁতিয়াপাড়ায় প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে আরম্ভ হয় সাত ভাই ক্লাবের পুজো। জনশ্রুতি এক নিঃসন্তান দম্পতি এই পুজো আরম্ভ করেন। পুরনো নুনপট্টিতে হয় সাতভাই কার্তিক। কাটোয়ার সার্বজনীন কার্তিক পুজো সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কার্তিকের লড়াই। এটা কার্তিক পুজোর পূর্বদিন হয়। আর কাটোয়ার সব থেকে অভিনব পুজো হলো হরিসভাপাড়ায় আমরা কজন-এর পরিচালনায় সার্বজনীন ন্যাংটো কার্তিক পুজো। এককালে কাটোয়ার পতিতারাই সন্তানস্নেহে ন্যাংটো কার্তিক পুজো শুরু করে হরিসভা পাড়ায়। কাটোয়ায় আর হয় থাকাকার্তিক। চার পাঁচ সাত এমনকী আট থাকের কার্তিক। থাকার মূল গড়নটি সিঁড়ির ধাপের মতো। থাকা তৈরির অনুপ্রেরণা নানান পৌরাণিক কাহিনী।

কাটোয়ার পর বাঁশবেড়িয়া চুঁচুড়ার কার্তিক উৎসব বিখ্যাত। বাংলা প্রবাদে রয়েছে— 'কার্তিক কাঁসারি উদ্‌গেরে। তিন নিয়ে বাঁশবেড়ে।' চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলের কার্তিক পুজো বহুদিনের। জনশ্রুতি আছে যজ্ঞেশ্বর তলায় বুড়ো শিবের প্রতিষ্ঠা করেন চাঁদসদাগর এবং যজ্ঞেশ্বর তলায় কার্তিক পুজো করেন বুড়ো শিবশঙ্কর। অপর একটি লোকশ্রুতি হলো কার্তিক সংক্রান্তিতে বেহুলা যখন লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে গঙ্গায় এই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল সে সময়ে চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজো নিয়ে কোলাহল চলছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা হলো সোমবংশীয় এক জমিদার রামচরণ সোম ১৬৮৬ সালে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের দেওয়ান ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ও প্রেরণায় এখানে কার্তিক পুজোর চল হয়। প্রকৃতপক্ষে চুঁচুড়াতে ও বাঁশবেড়িয়ায় ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে সপ্তগ্রাম বন্দর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে। একদিকে শাহী সড়ক অপরদিকে গঙ্গা— মাঝামাঝি এই অঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। সপ্তগ্রাম থেকে সুবর্ণ বণিকরা এখানে বসতি স্থাপন করে। সোনার বেণে বলেই শুধু তারা সোনার ব্যবসা করবে তা নয়, নানা ধরনের ব্যবসা ছিল। দেখা যাচ্ছে কার্তিক পুজো কেন্দ্রীভূত হতো চুঁচুড়া বাঁশবেড়িয়ায় সুবর্ণ বণিক সমাজে। আবার বারাঙ্গনা, বণিক ও বন্দর এই তিনটি সংসর্গ চুঁচুড়ায় কার্তিক পুজোর সূচনা ও বিস্তারের কাজ করছে।

চুঁচুড়ার গোলাবাগানে লড়াই কার্তিক নামে যে মূর্তির পুজো হয় তা প্রকৃতপক্ষে মহিষাসুরবধের আঙ্গিককে স্মরণে রেখে। ১৬০ বছর ধরে এই পুজো চলে আসছে। ঠাকুরগলির আগের নাম ছিল হৌসখানা। ১৫০ বছর ধরে এই পুজো চলছে। বাবু কার্তিক তলাতে বাবুমূর্তিতে কার্তিক পুজো হয়। এখানকার মূর্তি হলো সাধারণ বাঙালি পোশাক ধুতিপরা, গায়ে শাল। কামার পাড়ায় ষড়ানন মূর্তিতে কার্তিক পুজো হচ্ছে প্রায় একশ বছর ধরে। এছাড়া বাঁশবেড়িয়া পোলে নটরাজ কার্তিক, ধোপাঘাটে অর্জুন কার্তিক, মহাকালীতলায় জামাই কার্তিক, বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুগলিতে নটরাজ কার্তিক বিখ্যাত। কেবল চুঁচুড়া পৌরসভাতেই সত্তরটি পুজো হয়ে আসছে। এছাড়া বাঁশবেড়িয়াতে রয়েছে আরও প্রায় শ'খানেক পুজো।

ঐতিহাসিক দুর্গ ঝাঁসি

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর হলো ঝাঁসি। প্রাচীরঘেরা শহরটি গড়ে উঠেছে শক্তিশালী দুর্গটিকে কেন্দ্র করে। 'ঝাঁসি' নামটি উচ্চারিত হলেই প্রত্যেকের মনে ফুটে ওঠে সেই বীরাঙ্গনা, রাজরাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরগাথার চিত্র। বুন্দেলখণ্ডের লোকমুখে তাই ফেরে— 'বুন্দেলে হরবোলে কে মুঁহ হমনে সুনি কহানী থী খুব লড়ী মর্দানী উওবতা ঝাঁসিওয়ালী রাণী থী।'

১৬১৩ খৃস্টাব্দে ওরছরাজা বীরসিংহ দেও দুর্গটি নির্মাণ করেন। মধ্য ভারতের শক্তিশালী দুর্গগুলির মধ্যে অন্যতম, পাথুরে বাঙ্গরা পর্বতের ওপর অবস্থিত ঝাঁসি দুর্গের রণকৌশলগত অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতায় ৩১২ মিটার এবং প্রস্থে ২২৫ মিটার এই অতিকায় দুর্গটি আয়তনে প্রায় ১০ একর বিস্তৃত। শক্তিশালী সুদৃঢ় প্রাচীরের উভয়দিকে অবস্থিত পরিখাগুলি দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে। দুর্গের দশটি প্রবেশদ্বার— খাচওরাওদ্বার, লক্ষ্মীদ্বার, সাগরদ্বার ইত্যাদি ছাড়া অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলি হলো— মহাদেবমন্দির, দেউড়িদ্বারে গণেশমন্দির, ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে ব্যবহৃত 'কড়ক বিজলী' কামান। অনতিদূরে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে তৈরি 'রাণী কা মহল' আজ প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের মিউজিয়ম। যেখানে ৯-১২ শতাব্দীর শতাধিক ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে সেগুলি বুন্দেলখণ্ডের শতাব্দী যাবৎ ঘটনাবহুল ইতিহাসকে তুলে ধরে। ১৮০৭-র সিপাহি বিদ্রোহের সাক্ষী 'রাণীমহলে'র অসামান্য স্থাপত্য দর্শনীয়, বারান্দাযুক্ত ৬টি বৃহৎ কক্ষগুলির দেওয়াল ও সিলিঙের বর্ণালী চিত্রগুলো মনমুগ্ধ করে দেয়। এই মহলেই রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁতিয়া টোপি ও নানা সাহেবের সঙ্গে মিলে ইংরেজদের পরাস্ত করার পরিকল্পনা করতেন। লক্ষ্মীবাঈ নির্মিত 'গঙ্গাধর রাও কী ছাতরী' দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থল। বীর সিংহদেও ও তার উত্তরসূরীরা মুঘলদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দুর্গটি প্রসিদ্ধ বীর ছত্রসাল বুন্দেলার অধিকারে আসে। ১৭২৯ সালে তিনি পেশোয়া বাজীরাওকে মুঘলদের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ তার রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করেন, ঝাঁসিও যার অন্তর্গত ছিল। সুদক্ষ প্রশাসক গঙ্গাধররাও নেওয়ালকরের শাসনকালে (১৮৩৫-১৮৫৩) ঝাঁসির প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। তার সঙ্গে বিবাহ হয় বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের। গঙ্গাধররাওয়ের মৃত্যু হলে বৃটিশ সরকার তার দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে তার উত্তরসূরী হিসাবে অস্বীকার করে। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসারে ঝাঁসিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করা হয়।

১৮৫৭ সালের মে মাস ভারত আকাশে বয়ে আনে মহাবিদ্রোহের ঘনঘটা। বিদ্রোহী সিপাইরা ঝাঁসি অধিকার করে বৃটিশ সৈন্যদের হটিয়ে। কোম্পানীর ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার পর ন-দশ মাস লক্ষ্মীবাঈ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। ঝাঁসি পুনর্দখলের লক্ষ্যে বিশাল বৃটিশবাহিনী পাঠানো হয়। 'মেরী ঝাঁসি দুঙ্গা নেহি' এই প্রতিজ্ঞা করে লক্ষ্মীবাঈ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ, নিপুণ, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলেন ও দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। মহিলারাও এই সংগ্রামে যোগদান করেন। পরাক্রমী যোদ্ধাদের দ্বারা সমৃদ্ধ ঝাঁসিবাহিনী ২৩ মার্চ ১৮৫৮-তে বৃটিশ বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় ও প্রবল বিক্রমে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। ঝাঁসিবাহিনীর গোলন্দাজদের সুনিপুণ গোলাবর্ষণে বৃটিশসৈন্য দলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং রণসাজে সজ্জিত হয়ে সমগ্র দুর্গ পরিক্রমা করে তাঁর সৈন্যদলের উৎসাহবর্ধন করতে লাগলেন। তাঁতিয়াটোপির নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যদল ঝাঁসিকে অবরোধমুক্ত করতে এসেও ব্যর্থ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। পরবর্তী তিনদিন ইংরেজদের সঙ্গে রাণীর সৈন্যদলের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দুই সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় বৃটিশবাহিনী দুর্ভেদ্য পশ্চিমদুয়ার বিধ্বস্ত করে নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। রাণীর বীর যোদ্ধাদল অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে বীরগতি প্রাপ্ত হন। তেরোদিনের যুদ্ধে পতন হয় ঝাঁসিদুর্গের। ইংরেজবাহিনী নগরে ব্যাপক লুণ্ঠন চালায় ও পাঁচশ'-র বেশি নাগরিককে হত্যা করে। নগরবাসী শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করে স্বহস্তে প্রাণ দিতে থাকে। স্ত্রীলোকরা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার্থে পরিজনদের অস্ত্রাঘাতে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করতে থাকে, অনেকে গভীর কূপে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। নিরুপায় রাণী পুত্র দামোদর ও অবশিষ্ট বিশ্বস্ত যোদ্ধাগণের সঙ্গে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় ঝাঁসি হলো ইংরেজ দ্বারা লাঞ্ছিত, পদানত ও লুণ্ঠিত।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ ১৮ জুন ১৮৫৮-এ গোয়ালিয়রের ভূমিতে রণচণ্ডীমূর্তি ধারণপূর্বক অসীম বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বীরগতি প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ সালে বৃটিশ সরকার ঝাঁসি দুর্গটি গোয়ালিয়রের মহারাজ জীয়াজীরাও সিন্ধিয়াকে সমর্পণ করলেও ১৮৮৬-তে তারা পুনরায় নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়। ভারত সরকার মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রীর স্মরণে ঝাঁসি ও গোয়ালিয়র দুর্গে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাণীর মর্মরমূর্তি স্থাপন করে।

ঝাঁসি দুর্গ যেন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের আত্মত্যাগ, রণনৈপুণ্য, প্রতিজ্ঞা ও বলিদানের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দেশবাসীকে ভারতজননীর সম্মানরক্ষার্থে সর্বস্ব অর্পণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

তিনি গর্জালেন অনেক, বর্ষালেন কই!

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

প্রতি সপ্তাহের এই চিঠি তো আপনাদের জন্যই লেখা হয়। তবু হঠাৎ এই বিশেষ সম্বোধন করে পত্রের অবতারণা কেন? নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা আপনাদের মনে উঠছে। তার জবাবই দেব। আসলে সম্প্রতি এক মজা দেখলাম। যেটা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে না নিলে শান্তি পাচ্ছি না।

মজাটার নাম 'পেট্রো-মজা' বলতে পারেন। প্রায় এক সপ্তাহ কাল ধরে সেই মজা প্রদর্শন চলল কখনও কলকাতায়, কখনও দিল্লিতে। কখনও আবার ফ্রান্সেও। এই মজাকে আবার নাটকও বলতে পারেন। এই চিঠির ছোট্ট অবসরে তার পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। বুদ্ধিমান পাঠক, পাঠিকারা বুঝে নেবেন। তার আগে নাটকের প্রেক্ষাপটটা বলে নেওয়া যাক।

আচমকা বাড়ল পেট্রোলের দাম। চলতি বছরে এনিয়ে পাঁচ বার। অটলবিহারী বাজপেয়ীর পর ২০০৪ সালে ক্ষমতায় আসেন মনমোহন সিং। পেট্রোপণ্যের দামে বিকেন্দ্রীকরণের মনমোহিনী নীতি তারপর খুলে দিল অর্গল। বাজপেয়ীর আমলের ৩৩ টাকা ৭১ পয়সা লিটারের পেট্রোল এখন ৭৩ টাকা ১৫ পয়সা। ডিজেল ২১ টাকা ৭৪ পয়সা থেকে বেড়ে ৪১ টাকা ২৯ পয়সা। আর গরিবের কেরোসিন তেল ৯.০১ টাকা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ১৪.৮৩ টাকা। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ২৪১ টাকা থেকে এখন ৩৯৫ টাকা ৩৫ পয়সা। নভেম্বরের গোড়ায় শেষ দফা পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির পর শুরু হলো নাটক। নাম 'পেট্রো-পালা'।

দৃশ্য-১

দাম বৃদ্ধির ঘোষণা শুনেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুমকি দিলেন, না এটা সহ্য করা যায় না। এটা মা-মাটি-মানুষের প্রতি অবিচার। চরমতম সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এবং সেটা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। টিভি-কাগজ তোলপাড় হয়ে গেল। কী হয়! কী হয়!

দৃশ্য-২

৪ নভেম্বর। কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন টিভি সংস্থার ও বি ভ্যান। একে একে বীরের মতো তৃণমূল ভবনে ঢুকছেন তৃণমূল সাংসদরা। চরমতম সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। টান টান বিশ্লেষণ চলছে। কিন্তু হায়, সেখানে তো তৃণমূল নেত্রীই নেই? সিদ্ধান্ত নেবেন কে? মিটিং শেষে নেতারা গাড়ি ধরার আগে বললেন চরম সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তবে যা বলার বলবেন নেত্রী। নাটক তখন চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছে।

দৃশ্য-৩

সকাল থেকেই সেদিন মহাকরণে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংসদীয় কমিটি লিফট থেকে নেমে ঢুকলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ঘরে। কয়েক মিনিট শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বসে আছে বাংলা। টিভির সামনে দিল্লিও। মুখ্যমন্ত্রীর পিছু পিছু দল বেঁধে বেরিয়ে এলেন সাংসদরা। এবার সাংবাদিক সম্মেলন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলো ঠিকরে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। তিনি বাংলায় বললেন, সংসদীয় কমিটি সরকার ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমি বলেছি, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাঠক, পাঠিকারা এখানে মনে রাখবেন, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁর বক্তব্যে একবারও পেট্রোলের দাম কমানোর দাবি তোলেননি। বলেননি, সিদ্ধান্ত না ফেরালে তাঁরা সরকার ছেড়ে দেবেন।

দৃশ্য-৪

মহাকরণে এহেন ঘোষণার পর ভিন রাজ্যের তথা জাতীয় সংবাদ মাধ্যম সেই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই হিন্দি বা ইংরেজিতে শুনতে চাইলেন। সেটা সব সময়ই দিয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেদিন তিনি বললেন, বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় বলা যাবে না। দরকার হলে অনুবাদ করে নিন। ভাবছেন, আহা মমতার নতুন এক রূপ দেখা গেল। বঙ্গীয় প্রাদেশিকতা নয়, এ হলো নেত্রীর মাতৃভাষার প্রতি অপার শ্রদ্ধা। কিন্তু হে পাঠক-পাঠিকা কুল, আপনাদের জানিয়ে রাখি হিন্দি বা ইংরেজিতে বললে সেটা অনেক স্পষ্ট হয়ে যেত সনিয়া গান্ধী কিংবা মনমোহন সিংয়ের কাছে। অনুবাদের তত গুরুত্ব থাকে না। সেটাকে অপব্যাখ্যা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

কলকাতায় মহাকরণে যখন এই চাতুরির নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রয়েছেন ফ্রান্সের সমুদ্র ঘেরা কান শহরে। জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে সেই রাতেই তিনি সব শুনে মন্তব্য করলেন, টাকা কি গাছে ফলে? সঙ্গে জানালেন, তাঁর সরকার পেট্রোপণ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি বিকেন্দ্রীকরণের পথে হাঁটবে।

দৃশ্য-৫

মাঝে ক'টা দিনের নানা সংলাপ ছোঁড়াছুঁড়ির পর নাটকের চরমতম ক্লাইম্যাক্স ৭ নভেম্বর। অভিনয়স্থল একই সঙ্গে নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও কলকাতায় রাজভবন। জোড়া বৈঠক। দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সিংহবিক্রমে হুঁশিয়ারি দেওয়া তৃণমূল সাংসদরা দিল্লির রেসকোর্স রোডে গিয়ে মূষিক হয়ে গেলেন। পেট্রোলের দাম নিয়ে কথা না বলে আলোচনা হলো কীভাবে ইউ পি এ শরিক দলের মধ্যে নিয়মিত বোঝাপড়া বৈঠক করা যায়। হায়, হায়, হায়, হায়!

এদিকে রাজভবনে রাজ্যপাল এম কে নারায়ণের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়ালেন কিন্তু কথা বললেন না। হাজার আলোর সামনে দাঁড়াতে অভ্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর নাকি ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় সমস্যা হলো। সেই যে কারণে তিনি হুঁশিয়ারির কথা বাংলা ভিন্ন কোনও ভাষায় বলেননি, ঠিক সেই কারণেই এদিন কথাই বললেন না তিনি। একটু পরে পছন্দের এক নিউজ চ্যানেলে পছন্দের এক সাংবাদিককে লাইভ ফোনে জানালেন, এবারের মতো চরম সিদ্ধান্ত নয়। তবে এরপর পেট্রোপণ্যের দাম বাড়লে তিনি নাকি কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে দেবেন।

এমন জায়গায় এসব বললেন যেখানে কোনও অপ্রিয় প্রশ্ন উঠবে না। জানতে চাওয়া হবে না, দিল্লি বা কলকাতায় বৈঠকে কী কথা হলো? কেন তিনি এত সহজে মেনে নিলেন মা-মাটি-মানুষের কষ্ট? এই মেনে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ আসবে কি রাজ্যে? আপনাদের মতো আমিও মনে এইসব প্রশ্ন নিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় আছি। কেউ জানতে পারলে জানাবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাতুরি রাজনীতিকে কুর্নিশ জানিয়ে শেষ করছি।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে কোনও উদ্যোগ-ই নেই সরকারের : অরুণ জেটলি

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি একজন স্বনামধন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিজে একজন নামজাদা আইনজীবী, সুবক্তা, সাংসদ এবং নাগরিক স্বার্থরক্ষায় একজন যোদ্ধা। তাঁর মতাদর্শ আজ বিশেষ গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক জীবন শুরু সেই ১৯৭৫ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মাধ্যমে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সভাপতি ওই বছরেই। প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতা বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক, দলের প্রবক্তা এবং বাজপেয়ী জমানায় এন ডি এ সরকারের আইনমন্ত্রীর অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। এহেন এক ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হন অন্বাচরণ বশিষ্ট। তাঁর কাছে খোলামেলা কথা বলেন শ্রী জেটলি। সেই একান্ত সাক্ষাৎকারটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হলো।

❑ **আপনি তো বিরোধী দলনেতা হিসাবে রাজ্যসভায় দু' বছর কাটালেন। আপনি দলের কাজ সম্পর্কে কতটা সন্তুষ্ট?**

● ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু বিষয়টা অন্যের চোখে কেমন তা দেখা দরকার। তবে বলা দরকার— দলের সমস্ত সাংসদ সোৎসাহে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশ নেন। বাস্তবিক-ই আমাদের দলের রাজ্যসভায় ভূমিকা সদর্থক।

❑ **গত ২৭ আগস্ট সংসদের উভয়সভাতেই লোকপাল বিল নিয়ে সহমত পোষণ করা হয় এবং এক প্রস্তাব পাশ হয়। আপনি কি মনে করেন যে, এই প্রস্তাব সংসদে শক্তিশালী লোকপাল বিল পেশের ক্ষেত্রে রাস্তা আরও সুগম করলো?**

● সংসদ এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাব নিয়েছে এবং এই প্রস্তাব-ই লোকপাল বিল পেশের রাস্তা আরও মসৃণ করলো। তবে দেখতে হবে সরকার কীভাবে বিলটি রচনা করে এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ কতটা গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস কোনও না কোনওভাবেই শক্তিশালী লোকপাল বিল নিয়ে টালবাহানা করবেই। সবকিছু নির্ভর করছে সরকার কীভাবে সংসদে বিলটা পেশ করছে তার ওপর।

❑ **কংগ্রেস আন্না হাজারের এই আন্দোলনকে খাটো করে দেখাচ্ছে। এই আন্দোলনের পেছনে আর এস এস ও বিজেপি-র যোগাসাজস নিয়ে কটাক্ষ করেছে। এই বিষয়ে আপনার মত কী?**

● আর এস এস ও বিজেপি কেবলমাত্র দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে বা যাঁরা নামবেন তাদেরই সমর্থক। এই আন্দোলন শুধুমাত্র নাগরিক সমাজের আর আন্নাজী কেবল এর শীর্ষ নেতা। কংগ্রেসের অভিযোগ একেবারেই ঠিক নয় যে আর এস এস-বিজেপি এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করছে।

❑ **২০০৮ সালের টাকার বিনিময়ে ভোট দুর্নীতিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলি পুরো দায়টা চাপিয়ে দিচ্ছে বিজেপি-র ওপর। যখন বিজেপি-র সাংসদ সুধীন্দ্র কুলকার্ণী দুর্নীতিটা সামনে এনেছেন।**

● টাকা দিয়ে ভোট কেনার বিষয়ে তদন্তটি সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। সাংসদ এবং কুলকার্ণীজীরা বিষয়টাকে সামনে এনেছেন। যখন তদন্তে দেখা গেছে সত্যিই ঘুষ দেওয়া হয়েছিল এবং এ নিয়ে কোনও মামলা দায়ের না করেই যাঁরা বিষয়টাকে জনসমক্ষে এনেছেন তাঁদের নির্বিচারে যেভাবে জেলে পোরা হয়েছে তা কার্যত অনৈতিক।

❑ **গতবারের শীতকালীন অধিবেশন পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায় ২-জি মামলা নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্ত না করানোর সিদ্ধান্তে সরকারের অনড় মনোভাবের জন্য। এ ধরনের বিষয়ে সরকার-বিরোধী কাজিয়া হামেশাই হচ্ছে এবং সংসদ অচল হয়ে পড়ছে। আপনার মতে, সংসদ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার দাওয়াই কি?**

● ইতিহাস-বিরোধী-মতকেই গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১০ সালের শীতকালীন সংসদীয় অধিবেশন বানচাল হয়ে যায় কারণ কিছু ভয়ানক অভিযোগ এবং তার তদন্তের ভার সংসদীয় কমিটির ওপর ন্যস্ত করার জন্য বিরোধীদের দাবি নিয়ে। সমস্ত প্রকাশিত তথ্য যা ২০১০ সালে বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ওই বছর বহু অপরাধমূলক কাজ হয়েছে এবং এ নিয়ে চার্জশীট পেশ হয়েছে আদালতে আর সংশ্লিষ্ট অনেকেই এখন জেলে। কিন্তু এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধীপক্ষের যথেষ্ট চাপ না থাকলে এমনটা ঘটত না।

❑ **পি এ সি এবং জে পি সি মূলতঃ অরাজনৈতিক সংস্থা এবং সংস্থা দুটি প্রতিটি জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই দুই মূল লক্ষ্যই উবে যাচ্ছে। যদি রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি সর্বব্যাপী হয় তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে এর আঁচ পড়বে না?**

● আমার মনে হয় যে, পি এ সি এবং জে পি সি-র স্বাধীন সত্তাকে মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কংগ্রেস। কারণ কংগ্রেস দুই সংস্থারই

কার্যপ্রণালীতে বাধাদান করছে। তারা চাইছে না সংস্থা দুটি সত্য উদ্‌ঘাটন করুক বরং চাইছে তথ্যকে ধামাচাপা দিক।

❑ বিভিন্ন মহল বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন বিচারব্যবস্থার অতি-সক্রিয়তার কথা। এ নিয়ে আপনারা দৃষ্টিভঙ্গী কী যখন বিভিন্ন বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছে সেইসব বিষয়ে যা প্রশাসনিক কর্তাদের মাধ্যমেই সমাধান হয়ে যায়?

● বিচারব্যবস্থায় অতি সক্রিয়তা এড়ানো দরকার। বিচার ব্যবস্থায় অতি সক্রিয়তা আর বিচারের মান্যতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। অতি সক্রিয়তার মাধ্যমে আদালত প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসার, সক্রিয় হবার নির্দেশ দেয়।

❑ বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধারের বিষয়ে সরকারি কাজকর্মে আপনি কতটা খুশি?

● আদৌ নই। কারণ সরকারি ব্যবস্থায় বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বাস্তবিক সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়নি যতটা উন্নত দেশগুলি নিয়েছে।

❑ জে এম এম দুর্নীতির মতো বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় সাংসদদের যে রক্ষাকবচ রয়েছে তারই আড়ালে পার পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। সংসদকে কিছুতেই দুর্নীতি-র আখড়ায় পরিণত করা যায় না এবং সুবিধার অজুহাতে অপরাধকেও মেনে নেওয়া যায় না। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সমাধান কি?

● আমি নিরাশাবাদী নই। আমি মনে করি না যে, সাংসদদের শাস্তি বিধানের আইন না থাকলেই সংসদ দুর্নীতি আখড়ায় পরিণত হবে এমনটা নয়। এই দেখুন না, আইন না থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রশ্নের জন্য টানা মামলাতেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

❑ ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে, ইউ পি এ সরকারের কোনও নেতার বিরুদ্ধে যখনই কোনও অভিযোগ উঠছে তখনই একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করায় পরিবর্তে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করতে সচেষ্ট কংগ্রেস। এই পরিস্থিতির কী ব্যাখ্যা আছে আপনার?

● দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা কখনও একটাকে ঠিক বলতে পারে না। কেবল পাল্টা অভিযোগ আপনাকে অভিযোগ মুক্ত করে না। আমাদের উচিত দলমতনির্বিশেষে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করে ফেলা তা যেখানেই ঘটুক না কেন।

❑ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমান খুরশিদ বলেছেন যে, শক্তি থাকলে বিজেপি সাম্প্রদায়িক হিংসা দমন আইন বিলটি বাধা দিয়ে দেখুন!

● আমি মনে করি না যে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা সামান্যতম রাজনৈতিক সচেতনতা রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তি-ই এই বিলকে সমর্থন করবে। এই বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিনাশ করবে। এই বিল চরমতম অন্যায়।

❑ অন্য গণতন্ত্রে যেমন ইউ এস এ এবং ইউ কে-তে আইন প্রণেতারা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি মতো কাজ করে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে। যেমন সন্ত্রাস বিরোধিতায়, কালো টাকা উদ্ধারে এবং দুর্নীতি দমনের জন্য আইন প্রণয়ন ইত্যাদিতে। অথচ এদেশে সাংসদরা তার রাজনৈতিক প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কখনও কী বার্তা আছে তার অপেক্ষায়। আমাদের দেশে এমনটা কেন ঘটে?

● বৃটেনে বিশেষত যখনই সেখানে দলত্যাগ ঘটে তখনই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। আর এতে কখনই বৃটিশ রাজনীতির নৈতিকতায় কশাঘাত হয় না। ভারতে দলত্যাগ নৈতিকতায় কশাঘাত করে এবং এই জন্যই দলত্যাগ বিরোধী আইন তৈরি করতে হয় যাতে করে দলের হুইপ সংসদে কেউ অমান্য না করে।

❑ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে 'ক্লিন' বলে মনে করা হয়। ২-জি স্পেকট্রাম মামলায় চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে আঙুল উঠলে এবং এ রাজা যখন দাবী করছেন সবকিছু ঘটেছে প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই, তখন কি প্রধানমন্ত্রীর ছবি কলঙ্কিত হয় না?

● প্রধানমন্ত্রী একজন দুর্বল ব্যক্তি। ক্ষমতায় থাকার লোভে তিনি সমঝোতা করে চলেছেন। এর পরিণাম হলো তিনি নিজেকে যতই সাফ-সুতরো বলে জাহির করুন আসলে তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত সরকারের নেতা।

❑ যদি সুপ্রীম কোর্টের চাপে চিদাম্বরমকে পদত্যাগ করতে হয়, তবে কি আপনি মনে করেন সরকার ভেঙ্গে যাবে এবং আগামী বছরে যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হবে তার সঙ্গে কী লোকসভা নির্বাচনও সংঘটিত হবে?

● আমি জানি না সুপ্রীম কোর্ট কী রায় দেবে। তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে, ২০০৮ ও ২০১০ সালে স্পেকট্রাম বন্টন নীতি নিয়ে চিদাম্বরমের সায় ছিল এ-রাজার প্রস্তাবে।

❑ মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে আপনার মতে দেশের ভোটদাতাদের সমর্থন কোন দিকে ঝুঁকবে?

● আমার মনে হয় এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে কংগ্রেস অনেকটাই ব্যাকফুটে থাকবে, রক্ষণাত্মক হবে। কংগ্রেস দলের হাল খুব খারাপ। এদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নেতৃত্ব নিয়ে ঝামেলা রয়েছে।

❑ এটা খবর যে, ইউ পি এ-র লেখচিত্র নিম্নগামী এবং এন ডি এ-র চাহিদা বাড়ছে। এমত অবস্থায় মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে চর্চা বেশ উচ্চগ্রামে। এনিয়ে আপনার বক্তব্য কি?

● স্পষ্টতঃ এখন দেশে দুটি জোট সরকার গড়ার ক্ষেত্রে উপযোগী। ইউ পি এ-র পতন মানে অবশ্যই এন ডি এ-র উত্থান। বর্তমানে বিজেপি-র কর্মদক্ষতা বেড়েছে এবং দলের অন্দরের অবস্থাও খুব ভাল। সুতরাং লোকে ভাবছে এন ডি এ ক্ষমতায় এলে কে প্রধানমন্ত্রী হবে। এই মুহূর্তে আগাম বলা সম্ভবপর নয় যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমরা সঠিক সময়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা করব এই বিষয়ে।

(সৌজন্য : 'অর্গানাইজার'।
ভাষান্তর : তারক সাহা)

মহাশক্তিধর হওয়ার প্রতিযোগিতায় নয় ভারতবর্ষ ভারত হয়েই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে : শ্রীভাগবত

অনুষ্ঠানে জাতীয় মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' গীত হওয়ার মুহূর্তে মোহনরাও ভাগবত (মাঝে), তাঁর ডান দিকে যথাক্রমে মহুয়া ধর ও আত্মস্থানন্দময়ী মা। বাঁ দিকে যথাক্রমে প্রমীলা তাই মেঢ়ে, জ্ঞানানন্দময়ী মা ও সেবিকা সমিতির সেবিকারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ বিশ্বে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। আমেরিকা আজ মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়া যদিও আজ এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে এবং ভেঙেও গেছে। চীন চেষ্টা করছে। মহাশক্তিধর হওয়ার এই প্রতিযোগিতায় ভারত থাকবে না। নিজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষ ভারত হয়ে উঠবে। বৈভবসম্পন্ন শক্তিশালী হয়ে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা ভারতের উদ্দেশ্য নয়। 'স্ব' বা নিজস্বতাকে ভিত্তি করে ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে। ভগিনী নিবেদিতা আপন জীবন দিয়ে এটা করে দেখিয়েছেন এবং আমাদের করতে বলেছেন। গত ১০ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনের সভাঘরে এইভাবেই ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। ভগিনী নিবেদিতা প্রয়াণ শতবর্ষ উদযাপন সমিতি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। উল্লেখ্য, নিবেদিতা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ তেরোটি বছর ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনে সমর্পণ করে ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

এদিন সকালে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কলকাতায় গোয়াবাগান পার্ক থেকে শুরু হয়ে মহাজাতি সদনে শেষ হয়। সেখানে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কর্ম সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীভাগবত।

গোয়াবাগান থেকে মহাজাতি সদন — মহানগরীর বুকে সেবিকা সমিতির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার একাংশ।

সমাবেশ সমাচার

এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রণব কন্যা আশ্রমের প্রধান জ্ঞানানন্দময়ী মা। সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা প্রমীলা তাঈ মেঢ়ে। শ্রীমতী মেঢ়ে বলেন, শুধু মহিলাদের মধ্যে নয়, সমগ্র হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাব বা জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য ভগিনী নিবেদিতা সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। পরিবার ব্যবস্থাই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি। পরিবারে মাতৃশক্তিই মুখ্য। ঘর সামলেও শ্রেষ্ঠ জীবন মূল্যবোধগুলির বীজ বপন পরিবারে মায়েরাই করে থাকেন। পরিবারের কেউ বিপথে চালিত হলে স্নেহমমতা দিয়ে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। নিবেদিতা এই মাতৃশক্তি জাগরণের কাজ করেছিলেন।

শ্রীমতী মেঢ়ে আরও বলেন, ভারতের জন্য নিবেদিতার পরিকল্পিত গৈরিক পতাকায় ছিল বজ্র চিহ্ন ও বন্দেমাতরম মন্ত্র। এর অর্থ হলো ব্রজাঘাত হলেও নিজেদের সংকল্পে অটুট থাকবো। রাষ্ট্রের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করবো।

শ্রী ভাগবত বলেন, বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা ধর্ম জীবনকে ধারণ করে। বিশ্বে সমৃদ্ধি, বিকাশ ও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শান্তি নেই। বিশ্ব মনে করছে, ভারতবর্ষ এই শান্তির সন্ধান দিতে পারে। বৃটিশ রাজত্বে রুটি-কাপড়-মকান, আইন-শৃঙ্খলা কিংবা স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অভাব ছিল এমন নয়। আমাদের জীবনের মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমরা

স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাষণে— লেখায় এই বিষয়টিই ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকে যুগানুকুল অভিব্যক্তি করা আজ দরকার। এই মূল্যবোধের উপরই ভারতবর্ষকে আজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভগিনী নিবেদিতা এই কাজটিই নিজের জীবনে করেছেন। আমাদেরও তা করে দেখাতে হবে। নিবেদিতা ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি, এখানে বড়ও হননি, কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের কল্যাণে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। এই একাত্মভাব জাগ্রত হলে অন্য সব ত্রুটি বিচ্যুতি গৌণ হয়ে যায়। ভারতের জন্য বেদনা তাঁকে কর্মের প্রেরণা দিয়েছে। অপমান সহ্য করেও শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজে ঝাড়ু হাতে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কারে নেমেছেন। স্বামীজীর কথামতো গুরু গোবিন্দ সিং-এর জীবনকে তিনি আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন যিনি সমাজের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করলেও উপেক্ষিত হয়েছেন এবং দূরে গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। ভারতকে ভারত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা— এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। ভগিনী নিবেদিতাকে অনুসরণ করে সেই কাজে জীবন উৎসর্গ করা আমাদের কর্তব্য।

মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহিকা শ্রীমতী মহুয়া ধর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৌসুমী কর্মকার। সকলকে ধন্যবাদ জানান মায়া মিত্র। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংস্কার ভারতীর পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও সকলের উপভোগ্য হয়।

পরলোকে জীবেন্দ্রনাথ পোদ্দার

গত ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জীবেন্দ্রনাথ পোদ্দার পরলোক গমন করেছেন। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় জীবুদা। মালদা শহরে ১৯৪২ সালে প্রথম সঙ্ঘের শাখা স্থাপনের সময় তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। সম্প্রতি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে একমাত্র পুত্র সৌরভ পোদ্দারের কাছে কলকাতাতে থেকে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সঙ্ঘের নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেছেন। মালদার ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবুদা শেষ জীবনে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি ও পরে উত্তরবঙ্গের প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন। ললিতমোহন স্কুলের পরিচালন সমিতিরও সদস্য ছিলেন।

অসমে আরোগ্য মিত্র যোজনার প্রগতি বর্গ

গত ১৪ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল আরোগ্য মিত্র যোজনার ''প্রগতি বর্গ'' নামে ২০ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির করিমগঞ্জ জেলার শ্রীগৌরী মাধবধামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই শিবিরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও ত্রিপুরা থেকে ৫২ জন পুরুষ আর ৫২ জন মহিলা সহ মোট ১০৪ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এই শিবিরে আরোগ্য মিত্র প্রকল্প প্রমুখ ডাঃ অরুণ কুমার ব্যানার্জী, ডাঃ গিরিশ নাথ, ডাঃ অচিন্ত্য নাথ, ডাঃ শম্ভু রাম বড়ো সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ''আরোগ্য ভারতীর'' সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ রাঘবেন্দ্র কুলকার্ণী, আরোগ্য ভারতীর রাষ্ট্রীয় সংযোজক ভাস্কর কুলকার্ণী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, অসম সহ-ক্ষেত্র প্রচারক গৌরীশংকর চক্রবর্তী, ক্ষেত্র-সেবা প্রমুখ উল্লাস কুলকার্ণী, দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচারক বলরাম দাস রায়, দক্ষিণ অসম প্রান্ত সেবা প্রমুখ দেব চন্দ্র সিং, দক্ষিণ অসম প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ শংকর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ করেন।

স্বর্গত আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর 'গীতা' প্রবচনের মুদ্রিত তৃতীয় খণ্ডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়া দিদি-মা সাধ্বী ঋতাম্ভরা। গত ১৩ নভেম্বর মহাজাতি সদনের (এ্যানেক্স) সভাগৃহে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়।

শব্দরূপ-৬০২ অরিৎ পাইন

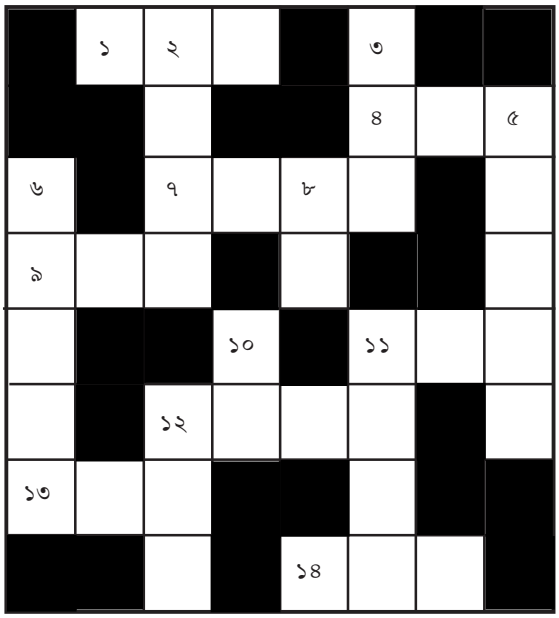

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. 'তোমায় দেখেছি—রাতে'; রবীন্দ্রসংগীত, শব্দার্থে চিরহরিৎ লতাবিশেষ, **৪.** ইনি ভগীরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ, **৭.** পাঁচটি মুখ বলে শিবের এই নাম, **৯.** তৎসম শব্দে সুখ, শান্তি, স্বস্তি, আগাগোড়া নিত্য-এর কোমল রূপ, **১১.** শ্রীকৃষ্ণের মাতুলালয় ও জন্মস্থান, **১২.** রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, **১৩.** এই কানন স্বর্গস্থিত উপবন, **১৪.** ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র।

উপর-নীচ ঃ ২. বিশ্বশ্রবার পুত্র, এঁর অন্যনাম কুবের, শেষ দুয়ে স্বামী, **৩.** প্রতিশব্দে ভালো দিবস, পুণ্যতিথি, **৫.** জমদগ্নি-ঋষির পুত্র, প্রথম তিনে কুঠার, **৬.** বিশেষণে গৃহহীন, নিরাশ্রয়, **৮.** শিবের প্রধান অনুচর, **১০.** বাংলার দশম মাস, **১১.** নরকাসুরের মহাবল পুত্র, প্রথম দুয়ে সুরা, শেষ দু'য়ে বন্যা, **১২.** স্বর্গের অপ্সরা বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

মা	দ্র	ব	তী	■	সা	■	প্রি
য়া	■	জ্রা	■	বা	য়	বী	য়
■	স	হ	স্র	ক	র	■	ং
জী	মূ	ত	■	ল	■	পা	ব
ব	ল	■	রি	■	গ	ল	দা
না	■	র	ক্ত	তি	ল	ক	■
ন	চি	কে	তা	■	গ্র	■	ভে
ন্দ	■	ট	■	বৃ	হ	ন্ন	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ ডিসেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

কলকাতায় সপ্তদশ চলচ্চিত্র উৎসব

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়োচিত চমকের ছড়াছড়ি

বিকাশ ভট্টাচার্য

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিনই গিমিক পছন্দ করেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা হিসেবের। তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে লাভ হবে না, এমন কোনও কাজ তিনি কদাচও করেননি এবং করবেনও না। সপ্তদশ চলচ্চিত্র উৎসবকেও তিনি যতটা না সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখেছেন তার থেকেও বেশি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করেছেন। এর আগে যখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনও রেলের কোষাগার মুক্ত করে

ওয়ানস্ আপন্ আ টাইম..

গেরিলা

শাঁওলি, অর্পিতা, ব্রাত্য, নচিকেতা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের মাসিক অর্থ বরাদ্দ করে দিয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁদের তৃণমূলের মঞ্চেও এনেছেন এবং অবশ্যই ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন। এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের শীর্ণ কোষাগার ভেঙ্গে চলেছে তাঁর প্রচারাভিযান। প্রচুর স্পনসর থাকা সত্ত্বেও সরকার গতবারের চেয়েও আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়েছে দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি। তাঁর বদান্যতায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার তৃণমূলের শহীদ দিবসে, একবার প্রতিদিনের মিলন সন্ধ্যায় 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'- এর পুরস্কার দেওয়া সত্বেও আবার তাঁকে এই চলচ্চিত্র উৎসবে ওই একই সম্মানে সম্মানিত করা হলো। উদ্বোধনী মঞ্চে উদ্বোধক দু'জনের থাকাই যথেষ্ট ছিল। সঙ্গে রাখা স্বাভাবিক ছিল বিদেশী অতিথিদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজনকে। যেমন সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত তুরস্কের পরিচালক নুরি বেলজ যাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন অ্যানাটোলিয়া' গত ১২ তারিখ নন্দনে দেখলাম। ওইদিনই দেখলাম বাংলাদেশের পরিচালক নাসিরুদ্দিন ইউসুফ-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ওপর তৈরি মর্মস্পর্শী 'গেরিলা'। এছাড়াও ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইটালো স্পিনেলি, ফ্র্যাঙ্কয়েজ ওজন ও এদেশের কেতন মেহতা, অনন্ত মহাদেবন প্রমুখ। এদের কারও সঙ্গেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাড়ে চারহাজার দর্শকদের সঙ্গে অন্ততঃ পরিচয়টুকুও করিয়ে দেওয়া হলো না। তার বদলে মঞ্চে দেখলাম— সুপ্রিয়া, সাবিত্রী, প্রসেনজিৎ, সন্ধ্যা রায়, গৌতম ঘোষ প্রমুখের। যাঁদের কলকাতার দর্শকরা বহুবার দেখেছেন ও শুনেছেন। এও এক চমক! দেখো আমার পেছনেও কত শিল্পী!

আর একটা বিষয়ে কৌতূহল জাগে। কারা এ উৎসবে আমন্ত্রিত? আমন্ত্রণের মাপকাঠি কি? এখানেও কি আমরা-ওরা? নাকি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ যাঁরা, অর্থাৎ শোভন, সুব্রত, অরূপ, মদনদের ঘনিষ্ঠ শিল্পীরাই আমন্ত্রিত? ইনডোর স্টেডিয়ামে যে সব শিল্পীদের দেখা গেল অর্থাৎ অতিথি হিসেবে যাঁরা আমন্ত্রিত ছিলেন তার বাইরেও বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালককে দেখা গেল না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে স্বয়ং ফেস্টিভ্যাল চেয়ারম্যান রঞ্জিত মল্লিক আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি উদ্বোধনে আসেননি। যদিও তিনি বলছেন তাঁকে ঠিকভাবে সঠিক ব্যক্তি আমন্ত্রণ জানাননি! স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানালেও তিনি কি আসতেন? যেখানে বুদ্ধবাবু আসছেন না! তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় খবর পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি সমাপ্তি উৎসবে হাজির থাকার কথা নিজমুখে বলেছেন। তবু বিতর্কটা এড়ানো যাচ্ছে না। মাধবী, শতাব্দী, তাপস এমনকী তরুণ মজুমদার, ঋতুপর্ণ— এঁদেরও দেখা গেল না। বাম জমানায় নন্দীগ্রাম নিয়ে তথ্যচিত্র করায় যাঁকে নন্দনে ছবি দেখাতে দেওয়া হয়নি এবং গত চলচ্চিত্র উৎসবেও যাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল— সেই ল্যাডলী মুখোপাধ্যায় এবারেও আমন্ত্রণ না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ। মোট ১২৫টি দেশের ১৫০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। এ দেশের বেশ কিছু ধ্রুপদী ছবি দেখার সুযোগ পাবেন বর্তমান প্রজন্মের দর্শকেরা। যেমন অশোক কুমার অভিনীত কিসমৎ, সত্যজিতের নায়ক, ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি তর্ক গপ্পো। চিত্রকর রবি বর্মার জীবন নিয়ে 'রংরশিয়া'ও বাণিজ্যিক মুক্তির আগে উৎসবে প্রদর্শিত হবে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উৎসব নিরুপদ্রব। আশাকরি আগামী কয়েকদিনও ভালোভাবেই উৎসব চলবে। তবে রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, নবীনা, নিউ এম্পায়ারে দর্শক আর একটু বেশি হলে ভালো হোত। ১১ তারিখ বাংলাদেশের ''ডুবসাঁতার'' ও ইরানের ''মিটিং'' ছবি দুটিতে ৪০ শতাংশ দর্শকও হয়নি।

নন্দীগ্রামের বীভৎসতা নিয়ে তথ্যচিত্র

বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের যাঁরা একসময় বামপন্থী অপশাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিলেন সেই সুনন্দ সান্যাল, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখ ইনডোর স্টেডিয়ামে ১০ তারিখ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান যখন চলছিল তখন প্রেসক্লাবে নন্দীগ্রামের বীভৎসতা বিষয়ে নির্মিত পরিচালক তুষার ভট্টাচার্যের তথ্যচিত্রের সিডি 'সূর্যোদয়ের দেশে'র লোকার্পণ করলেন। তুষারবাবু এর আগে মরিচঝাঁপি এবং বিজন সেতুর গণহত্যার উপর তথ্যচিত্র তৈরি করে আলোড়ন তুলেছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আনন্দমার্গের কৃষ্ণেশ্বরানন্দ অবধূত সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যের বিষয় এই যে এই সভায় সুনন্দবাবু বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, মানুষ কেবলই অর্থনৈতিক দিক থেকে পেছিয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনও রাজনৈতিক দলেরই কোনও মাথাব্যথা নেই। কবি তরুণ সান্যাল বলেন, এক শ্রেণির মানুষ যেভাবে সমাজে লাঠি ঘোরাচ্ছে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। পরিবর্তন মানে কি কেবল মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ?

সমসময়ের অমোঘ উচ্চারণ নাটক ‘ছিন্নবীণা’

মিতদ্রু দত্ত

দীর্ঘ ৩৫ বছরের বামফ্রন্ট শাসন বদলে এল নতুন জোট শাসন। ‘পরিবর্তন’ আদৌ হলো কি? হয়তো অনেকেই বলবেন, সময় হয়নি এসব কথা বলার। উন্নয়ন নাকি অবনমন তা বলার সময় হয়নি। সত্যিই কি তাই? সংকল্প নাট্যগোষ্ঠীর নবতম প্রযোজনা নাটক ‘ছিন্নবীণা’। নির্দেশনা দেবাশিস দে। কাহিনীটি এইরকম— নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি পরিবার। স্বপ্ন দেখে দু’বেলা- দু-মুঠো পেট ভরে খাওয়ার এবং ভালো থাকার। মেয়ের বিয়ে, ছেলের একটা চাকরি। বাবা ও মা বৃদ্ধ হলে যাতে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলে। এমনই স্বপ্ন দেখেন পরিবারের কর্তা সমীর চট্টোপাধ্যায় (অশোকবাবু), তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা রায় (আশালতা), তাদের এক পুত্র (সুরজ) ও কন্যা (স্বাতী)। দক্ষিণ শহরতলির টালির চালের ঘরে বসে অশোকবাবু ভাবেন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে টাকা চাই। ছেলেটারও তো কিচ্ছু হলো না। চাকরি হবে তো...? তার মাঝেই পরিবর্তন ঝড়। তিনি ভাবলেন হয়তো বা বদল এল তাদের জীবনেও। ভুল ভাঙল মাত্র কিছু দিনেই। রাজা বদলাল। বদলাল না নৈরাজ্যের শাসন। আজও সেই দুর্নীতির স্রোতধারা। সেদিন ছিল সশব্দে আজ যদিও নিঃশব্দে, নিভৃতে। ‘চাকরি দেব টাকা লাগবে...দাও...দাও... করে দেব সব যা যা চাইবে সব শুধু তার বদলে আমাকে টাকা দাও...। যা পারবে তাই-ই দাও’! এমনই ফাঁদ পাতা রাজ্য জুড়ে। আর তাতেই আশাহত হন অশোকবাবু। স্বপ্ন ভাঙে। তিনিও তো বদলের স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলার অধিকাংশ মানুষের মতোই। মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, পাকা বাড়ি...না! কিছুই হয়নি। মাঝখানে কোনও এক নেতা কয়েক হাজার টাকা মেরে দিলেন। থানা অভিযোগ নিল না। অসহায় পিতা বুঝলেন তাঁর বিশ্বাস করা ভুল হয়েছিল। সময় বদলাল। রাজা বদলাল। বদলাল না দুর্নীতির ট্র্যাডিশন। বদলাল না ক্ষমতাসীন হওয়ার দম্ভ। এই নাটকটি অসাধারণ। বার বার দেখার মতো। নির্দেশনা সার্থক।

মূকাভিনয়ে ‘অস্থির সময়’ এক সফল মঞ্চায়ন

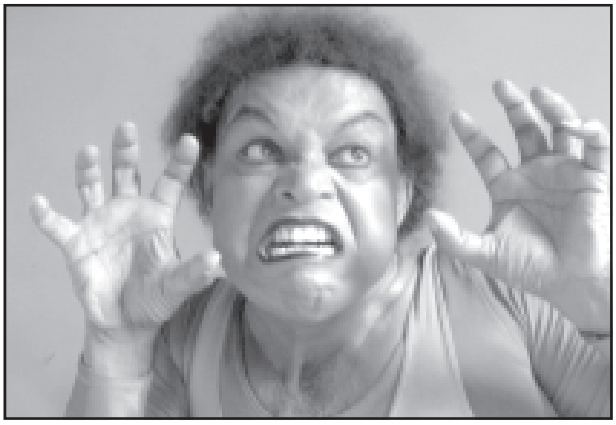

ইন্দিরা রায়।। ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে মূকাভিনয় অভিব্যক্তি প্রকাশের এক অন্যতম মাধ্যম। এই অভিনয় দক্ষতা প্রমাণে নতুন আঙ্গিক এনে মূকাভিনয়কে জনপ্রিয় করে তুলছেন বিখ্যাত মূকাভিনয় জুটি কমল নস্কর ও ডঃ শুভ্রা সান্যাল। মঞ্চে দু’জন শিল্পী; কিন্তু বাস্তবে তাঁরা দম্পতি। দু’জনের চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনায় প্রতি বছর দুর্গাপুজোর বোধনের আগেই উপস্থাপিত হয় নতুন আঙ্গিকে মূকাভিনয়। যার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সমাজের নানান সমস্যা। এ বছরে পঞ্চমীর দিন ৩০ সেপ্টেম্বর শিশির মঞ্চে সন্ধ্যায় পরিবেশিত হলো ‘টাইডাল টাইমস্’, যার বাংলায় তর্জমা ‘অস্থির সময়’। বর্তমান সমাজ অত্যন্ত অস্থির এবং সমস্যাসঙ্কুল। কতগুলো বিষয়কে তুলে ধরা হয় অস্থির সময়-এর শিরোনামে যেমন ফেলে আসা শৈশব, হয়তো ভালবাসা, চিকিৎসা বিভ্রাট, এখন রবীন্দ্রনাথ, যখন অভিনেত্রী, মদীর নেশা এবং যা দেবী। শরীরী ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো কমল নস্কর এই শিক্ষাকে হৃদয়হীন করে জনচেতনায় ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পরিণত ও উন্নতমানের পরিচায়ক।

এটুকু প্রমাণিত যে, শিক্ষাকে শিল্পী মনেপ্রাণে গ্রহণ করে কিশোর- কিশোরীদের উৎসাহিত করত এবং শিক্ষাচর্চার প্রচার-প্রসারে তা যথেষ্ট সফল। সবশেষে, প্রশংসিত শুভ্রা সান্যালের স্থির হওয়ার দেহভঙ্গিটা।

বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে মনকাড়া অভিনয় হলো এখন রবীন্দ্রনাথ, ফেলে আসা শৈশব। সম্পূর্ণ বাস্তব ছবিটাকে প্রাণহীন শারীরিক ভঙ্গিমায় জনগণকে স্পর্শ করার কৃতিত্ব উভয়েরই। সফল মঞ্চায়নের পশ্চাদ্‌পটে যার নাম উল্লেখ্য, তিনি শব্দযোজক নীলয় দত্ত এবং আলোক সম্পাতে পূর্ণ দাস। কমল নস্কর পরবর্তী প্রজন্মের এই শিল্পের প্রতি অনুরাগ গড়ে তুলতে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে শিবির করেন, এই শিবিরে উৎকর্ষতা তুলে ধরা তাঁর সফল পদক্ষেপ।